POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর।

(সূরা মায়েদা, আয়াত: ২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 26-27

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 26 জুন- 3জুলাই 2025 29 যুল হজ্জা- 7 মহররম 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

যে ব্যক্তি এই যামানাতেও আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য করে, সন্দেহ নেই যে, তাকে কবরে থেকে ওঠানো হয় এবং তাকে এক আধ্যাত্মিক জীবন দান করা হয়। এ কোন কল্পনা নয়, বরং তা বাস্তবেই প্রকাশিত হয় তার সাধুতার কার্যকারিতার দ্বারা। এবং আসমানী সাহায্য ও কল্যাণরাজি এবং রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মার অসামান্য সমর্থন সর্বদা তার সঙ্গী হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আমাদের নবী (সা.)-এর দাবী সূর্যের ন্যায় আলো বিচ্ছুরণ করছে, এবং আঁ হযরত (সা.)-এর চিরন্তন জীবনের এ এক বড় শক্তিশালী প্রমাণ যে, সেই প্রশংসিত পুরুষের (সা.) কৃপারাশিও চিরন্তনরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি, যে ব্যক্তি এই যামানাতেও আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্য করে, সন্দেহ নেই যে, তাকে কবর থেকে ওঠানো হয় এবং তাকে এক আধ্যাত্মিক জীবন দান করা হয়। এ কোন কল্পনা নয়, বরং তা বাস্তবেই প্রকাশিত হয় তার সাধুতার কার্যকারিতার দ্বারা। এবং আসমানী সাহায্য ও কল্যাণরাজি এবং রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মার অসামান্য সমর্থন সর্বদা তার সঙ্গী হয়। সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সে এক অনন্য ব্যক্তি হয়ে ওঠে। এমনকি, খোদা তা'লা তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দেন, এবং তার উপর বিশিষ্ট রহস্যাবলী প্রকাশিত করতে থাকেন, এবং আপন তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মজ্ঞানের ভাণ্ডার তার কাছে উন্মোচিত করে দেন। এবং আপনার ভালবাসা ও অনুগ্রহের লক্ষণসমূহ তার মধ্যে বিকশিত করতে থাকেন। এবং আপনার সাহায্যবলী তার উপর বর্ষণ করতে থাকেন। এবং আপন কল্যাণরাশি তার মধে সংস্থাপিত করেন। এবং তাকে আপন রবুবিয়্যতের (প্রভু-প্রতিপালকত্বের) আয়নায় রূপান্তরিত করেন। তার মুখ থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বাণী উচ্চারিত হতে থাকে। তার হৃদয় থেকে সব সূক্ষ্ম জ্ঞানেরন প্রস্রবন উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তার নিকট গোপন রহস্যাবলীর ভেদ উন্মোচিত হয়। এবং খোদা তা'লা তার উপরে এক আযিমুশশান তাজাল্লী-এক অতি মহিমামণ্ডিত জ্যোতির প্রকাশ সংঘটিত করেন। এবং তার সন্নিকটবর্তী হয়ে যানন। ত খন সে তার দোয়া ও প্রার্থনার জবাব প্রাপ্তিতে, আপনার কবুলিয়্যত বা স্বীকৃতিতে, নিগুঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও মারেফাতের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত করণে, এবং গোপন রহস্যাবলীর ভেদ উন্মোচনে, এবং তার উপরে আশিস ও কল্যাণরাশির বর্ষণে সবার উপরে উত্তীর্ণ হয় এবং সকলের উপর জয়যুক্ত হয়।

বস্তুতঃ খোদা তা'লা কৃর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, উল্লিখিত বিষয়াদির কারণে এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, এই বেচারা, এই অধম, এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার নামজাদা বিরুদ্ধবাদীদের কাছে কয়েক হাজার পত্র রেজিস্ট্রি ডাক যোগে পাঠিয়েছিল, যাতে করে এ ব্যাপারে তাদের কারো দাবী থাকরে সে যেন তা পেশ করতে পারে যে, উক্ত আধ্যাত্মিক জীবন খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর আনুগত্য ছাড়াও, অন্য কারো মাধ্যমেও পাওয়া যায়। এবং (তার এই রূপ দাবীর স্বপক্ষে পারলে) সে যেন এই অধমের মোকাবেলায় দণ্ডায়মান হয়। আর সে যদি তা না করে, তাহলে সে যেন সত্যান্বেষী হয়ে একদিকে আশিস ও মঙ্গল লাভের আশায় এবং অপরদিকে ঐশী-নিদর্শনাবলী দর্শনের উদ্দেশ্যে আমার নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু, কেউই সততার সাথে সৎ উদ্দেশ্যে এদিকে মুখ ফেরায় নি; বরং দূরে দূরে থেকে এবং এড়িয়ে চলে এটাই প্রমাণ করেছে যে, তারা সবাই অন্ধকারের মধ্যে নিপতিত। (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২২১)

তিনি আরও বলেন-ঐ সকল জাতির পবিত্র পুরুষদের কথা ছেড়ে দাও যাদের কথা কুরআন শরীফে বিস্তারিত বরা হয় নি। আমরা কেবর তাঁদের সম্পর্কেই বলছি যাঁদের উল্লেখ আছে কুরআন শরীফে। যেমন, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত ঈসা (তাঁদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক), এবং অন্যান্য নবীগণ (আ.), আমরা খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, যদি আঁ হযরত (সা.) দুনিয়াতে না আসতেন এবং কুরআন শরীফ নাযেল না হতো, এবং ঐ সকল কল্যাণ আমরা স্বচক্ষে না দেখতাম যা আমরা দেখতে পেয়েছি, তাহলে, অতীতের সমস্ত নবীগণের সত্যতা আমাদের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে যেত।কেননা, শুধু কেচ্ছা-কাহিনী থেকে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়, এবং তাদের প্রতি সে সব মোজেজা বা অলৌকিক ঘটনার কথা আরোপ করা হয়, সেগুলিও সব অতিরঞ্জিত। কেননা, সেগুলোর নামচিহ্নও এখন আর বাকী নেই। বরং ঐ সকল অতীত কেতাবগুলি থেকে খোদা তা'লার অস্তিত্বেরই কোন সত্যিকার প্রমাণ মেলে না। কারণ সেগুলি থেকে এই নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে না যে, খোদা তা'লা মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের পর ঐ সকল কেচ্ছা-কাহিনী বাস্তবতার রঙে রঙীন হতে পেরেছে। এখন আমরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে, এটা শুধু কথার কথা নয়,বরং এটা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা যে, খোদা কীভাবে মানুষের সাথে কথা বলেন, কীভাবে খোদার নিদর্শন প্রদর্শিত হয় এবং কীভাবেই বা দোয়া কবুল হয় এবং সমস্ত কিছুই আমরা পেয়েছি আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে। এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে কেচ্ছা-কাহিনীর আকারে যা কিছু বর্ণিত রয়েছে আমরা তা সবই পরখ করতে পেরেছি। অতএব, আমরা এমন এক নবীর আঁচল ধরেছি যিনি 'খোদা-নুমা' অর্থাৎ তিনি খোদাকে প্রদর্শিত করেছেন আমাদের কাছে।

আমরা কেমন করে সেই খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো, যে খোদা আমাদেরকে এমন এক নবীর আনুগত্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন, যিনি সাধুগণের আত্মাদের জন্য বস্তু জগতের সূর্যের মতই এক সূর্য, যা কিনা এক অন্ধকার সময়ে উদিত হয়েছে এবং আপন আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। তিনি না থেমেছেন, না পরিশ্রান্ত হয়েছেন, যতক্ষণ না তিনি আরবের সকর অঞ্চলকে শিরক থেকে পবিত্র করেছেন। তিনি নিজেই নিজের সত্যতার দলীল। কেননা, তাঁর আলো প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান। তাঁর সত্যিকার আনুগত্য মানুষকে পবিত্র করে ঠিক তেমনিভাবে,যেভাবে ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে সাফ ও স্বচ্ছ নদীর পানি। কে আছে এমন যে, সে পূর্ণ আন্তরিকতাসহ আমাদের কাছে এসেছে, অথচ ঐ আলো প্রত্যক্ষ করেনি? এবং কে সেই ব্যক্তি, যে খাঁটি আন্তরিকতার সাথে ঐ দরজায় কড়া নেড়েছে অথচ তার জন্য দরজা খোলা হয় নি? কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ মানুষের স্বভাবই এরকম যে, তারা ইতর জীবনযাপনই পছন্দ করে এবং তারা এটা চায় না যে, আলো তাদের অন্তরে প্রবেশ করুক।' (চাশমায়ে মারেফাত, পৃ: ২৮৮)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মুতার যুদ্ধের পরিস্থিতি বর্ণনা করে আঁ হযরত (সা.) বলেন: 'আল্লাহ্ আমার জন্য ভূমিকে উঁচু করে দিয়েছিলেন, এমনকি আমি তাদের যুদ্ধক্ষেত্র দেখেছি।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বলেন: মু'তার দিন আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছে। আর কেবল একটি প্রশস্ত ইয়েমেনি তরবারি আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল।

আঁ হযরত (সা.) মু'তার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা সাহাবাগণ সম্পর্কে বলেন: এরা পালিয়ে যাওয়ার নয়, বরং এরা পাল্টা আক্রমণকারী।

যুদ্ধ ও সেনাভিযানের প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী।

একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর হযরত জাফর -এর পুত্র আব্দুল্লাহকে সালাম করার সময় বলছিলেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ. অর্থাৎ হে দুই ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত ৯ মে, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (৯ হিজরত ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,মু তার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত আছে। এর বিশদ বিবরণ হলো, হযরত অওফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সেসব লোকের সফরসঙ্গী ছিলামযারা হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-র সাথে বের হয়েছিলেন। আমার সাথে ইয়েমেনের একজন লোকের দেখা হয়, তার কাছে শুধু একটি তরবারি ছিল। একজন মুসলমান একটি উট জবাই করে। সেই (ইয়েমেনি) লোকটি তার কাছে কিছু চামড়া চাইলে সে তাকে তা দিয়ে দেয়। [উটের চামড়া চেয়েছিল।] সে তা ঢালের মতো বানিয়ে নেয়। এরপর তিনি বলেন, আমরা যাত্রা করি এবং রোমান সেনাদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। তাদের মধ্যে একজনসৈন্য ছিল যে বাদামি রঙের ঘোড়ায় আরোহিত ছিল। তাতে সোনালি জিন ও সোনালি অস্ত্র ছিল। সেই রোমান সেনা মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিতে থাকে। সেই ইয়েমেনি লোকটি একটি পাথরের আড়াল থেকে তার দিকে এগিয়ে যায়। শত্রুর ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে দেয়, [যুদ্ধ হয়;] রোমান (সৈনিক) ভূপাতিত হয়। সে তরবারি নিয়ে তার ওপর চেপে বসে এবং তাকে হত্যা করে। মুসলমান (সৈনিক) তাকে হত্যা করে এবং তার ঘোড়া ও অস্ত্র নিয়ে নেয়। আল্লাহ্ তা'লা যখন মুসলমানদের বিজয় দান করেন তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সেই ব্যক্তির কাছে বার্তা পাঠান, যিনি রোমান সৈনিককে হত্যা করেছিলেন, আর তার কাছ থেকে কিছু সামগ্রী নিয়ে নেন। অর্থাৎ বলেন, তুমি সামগ্রীগুলো ফেরত দাও। হযরত অওফ(রা.) বলেন, আমি হযরত খালিদ (রা.)-র কাছে গিয়ে বলি, 'আপনি কি জানেন, আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন? খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) অল্প কিছুদিন পূর্বে ই মুসলমান হয়েছিলেন; তাই তার ধারণা ছিল, হয়ত তিনি জানেন না যে, আল্লাহ্ তা'লা কী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তা হলো, সেই সামগ্রী হত্যাকারীর জন্য হবে; অর্থাৎ যে শত্রুকে হত্যা করেছে, সেই শত্রুর জিনিসপত্র ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তার কাছেই থাকবে। খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বলেন, 'জি, আমি জানি, কিন্তু আমি (সম্পদের পরিমাণ) এর চেয়ে বেশি মনে করেছিলাম।' [যে সামগ্রী সে নিয়েছে তা তার প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশি ছিল।] তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, 'এই সামগ্রী ঐ ব্যক্তিকে ফেরত দিন, অন্যথায় আমি এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-কে অবহিত করব।' হযরত খালিদ (রা.) সামগ্রী ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। হযরত অওফ (রা.) বলেন, এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই। আমি সেই ব্যক্তির ঘটনা তুলে ধরি এবং হযরত খালিদ (রা.)-র আচরণের কথাও অবহিত করি। মহানবী (সা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী করেছ?' তিনি নিবেদন করেন, 'আমি একে অনেক বেশি সামগ্রী মনে করে কিছু অংশ নিয়ে নিয়েছিলাম।'তিনি (সা.) বলেন, 'তার কাছ থেকে তুমি যা কিছু নিয়েছ, তা তাকে ফেরত দাও।' হযরত অওফ (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'খালিদ, এখন নাও দেখি তার কাছ থেকে!' অর্থাৎ এখন তুমি এখন তুমি আর রাখতে পারবে না, মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। আমি কি তোমাকে বলি নি, এটা ফেরত দাও? যাহোক, যখন হযরত অওফ (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে এই কথা বলছিলেন, তখন মহানবী (সা.) তা শুনতে পান। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে?' তিনি (রা.) বলেন, আমি আবার পুরো ঘটনা বর্ণনা করি। পূর্বে সবকথা বলেন নি; এবার বলেন যে, আমি তাকে এটা ফেরত দিতে বলেছিলাম, কিন্তু তিনি তা করেন নি। তখন মহানবী (সা.) অসন্তুষ্ট হন। তিনি (সা.) আবার বলেন, 'খালিদ! তাকে জিনিসপত্র ফেরত দিও না।' [প্রথমে তিনি (সা.) সামগ্রী ফেরত দিতে বলেছিলেন, কিন্তু এখন তিনিই তা করতে নিষেধ করেন।] তারপর মহানবী (সা.) তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কি আমার মনোনীত আমীরদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দিতে চাও যে, তোমাদের জন্য থাকবে যুদ্ধের কৃতিত্ব আর তাদের জন্য থাকবে অপযশ বা অপখ্যাতি? যখন কেউ নেতা হয়, তখন (তাকে ডিঙিয়ে) তোমাদের সিদ্ধান্তকে সঠিক আখ্যা দেওয়া এবং তোমাদের এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যে, এর কৃতিত্ব তোমাদের ভাগে আসুক, আর যদি এর কোনো মন্দ দিক থাকে এর জন্য নেতারা দায়ী হবে- এটি ভ্রান্ত রীতি। তুমি যেহেতু আমাকে পুরো বিষয়টি অবহিত করেছ তাই আমি আমার আগের আদেশ প্রত্যাহার করছি এবং খালিদ যা করেছে তা ঠিক করেছে।'

এখানে আমীর বা নেতার সম্মান প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্য ছিল, তাই তিনি (সা.) বলেন, 'এভাবে তুমি আমীরকে তির্যক কথায় জর্জরিত করছ!' এ কারণে তিনি (সা.) তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মুতার যুদ্ধে কিছু মুসলমান শহীদ হন। মুসলমানরা মুশরিকদের (সম্পদের) কিছু অংশ মালে গনিমত হিসেবে লাভ করেন। এসব সামগ্রীর মধ্যে একটি আংটিও ছিল। একজন সেটি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেন। আমি তাকে বলি, সেই আংটিটি মহানবী (সা.) আমাকে দান করেছেন। হযরত খুযাইমা বিন সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রোমানদের মধ্যে একজন আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালে আমি তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিই। সে একটি শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিল যাতে ইয়াকূত বা চুনি পাথর লাগানো ছিল। আমার লক্ষ্য ছিল সেই চুনি পাথরগুলো হস্তগত করা; আমি সেগুলো হস্তগত করি। আমি যখন মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হই, তখন আমি তাঁর সামনে চুনি পাথরগুলো উপস্থাপন করি। তিনি (সা.) সেগুলো আমাকে উপহারস্বরূপ দান করেন।' তিনি (রা.) বলেন, 'আমি হযরত উসমান গনী (রা.)-র যুগে এগুলো এক হাজার দিনারে বিক্রি করি (এবং) আমি তা দিয়ে একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি।' আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, এসব রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসলমানরা মালে গনিমতও লাভ করেছিলেন; পরাজয় বরণ করেন নি বরং (বিজয় লাভের পর) মালে গনিমত লাভ করেছিলেন। পরাজয়ের তো কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। এটা ছিল একটি সামরিক কৌশল যা তারা অবলম্বন করেছিলেন, যে কারণে তারা ফিরে এসেছিলেন। যাহোক, তিনি বলেন, তারা তাদের (তথা শত্রুদের) নেতাদের থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদের নেতাদের হত্যা করেছিলেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) বর্ণনা করেন, 'মুতার (যুদ্ধের) দিন আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছিল এবং শুধুমাত্র একটি ইয়েমেনি চওড়া তরবারিই আমার হাতে রয়ে গিয়েছিল।' আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বলেন, 'এই রেওয়ায়েত

থেকে জানা যায়, মুসলমানরা মুশরিকদের ব্যাপকহারে হত্যা করেছিলেন, নতুবা তারা মুশরিকদের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, অপরদিকে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষাধিক। এটিই মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের একমাত্র সুদৃঢ় প্রমাণ, (বাকি) আল্লাহ্ই ভালো জানেন।'

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হযরত কুতবা বিন কাতাদা (রা.) মুসলমান বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি মালেক বিন রাফেলাকে আক্রমণ করেন, যে খ্রিষ্টান বেদু ইনদের নেতা ছিল। তিনি (রা.) তাকে হত্যা করেন। হযরত কুতবা (রা.) এ নিয়ে গর্বভরে আরবী পঙক্তিতে বলতেন, 'আমি রাফেলা বিন ইরাশের পুত্রকে এমনভাবে বর্শা দিয়ে আঘাত করি যা তার দেহের গভীরে প্রবেশ করেছিল, এরপর সেই বর্শাটি ভেঙে যায়। যখন আমি তার গ্রীবায় মোক্ষম আঘাত করি, তখন সে ঝুঁকে পড়ে– যেভাবে সালম (কাঁটাযুক্ত) গাছের কাণ্ড ঝুঁকে পড়ে। আমরা তার চাচাতো ভাইদের স্ত্রীদের সেভাবে হাঁকিয়েছি যেভাবে পশু হাঁকানো হয়।' হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) বর্ণনা করেন, যেদিন হযরত জা'ফর (রা.) এবং তার সাথিরা শহীদ হন, সেদিন মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন। তিনি (সা.) বলেন, 'আমার কাছে জা'ফরের ছেলেদের নিয়ে আসো।' আমি তাদেরকে তাঁর সামনে উপস্থাপন করি। তিনি (সা.) তাদেরকে জড়িয়ে ধরেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বইতে আরম্ভ করে। আমি নিবেদন করি, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.), আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি হযরত জা'ফর এবং তার সাথিদের ব্যাপারে কোনো খবর পেয়েছেন?' তিনি (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ, আজ তাদের মাথায় শাহাদাতের মুকুট পরানো হয়েছে।' তিনি বলেন, আমি উঠে কাঁদতে লাগলাম। মহিলারা আমার কাছে জড়ো হয়ে যায়। মহানবী (সা.) নিজের পরিবারের কাছে গিয়ে বলেন, 'জা'ফরের পরিবারের প্রতি উদাসীন হয়ো না, তাদের জন্য কিছু খাবার বানাও। আজ তার স্বামীর মৃত্যুতে আমি ভারাক্রান্ত।' অর্থাৎ লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন, আজ তাদের বাড়িতে খাবার পাঠিয়ে দিও।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের মিম্বরে আসেন এবং হযরত যায়েদ, হযরত জা'ফর ও ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর দেন। তারা সেই দিনই শহীদ হয়েছিলেন, যদিও বাহ্যত তাদের শাহাদাতের সংবাদ আসে নি। তিনি (সা.) বলেন, 'এখন হযরত যায়েদ ইসলামের পতাকা তুলে নিয়েছেন। [অর্থাৎ তিনি (সা.) ঘটনাটি বর্ণনা করেন।] তিনি শহীদ হয়ে যান; তখন হযরত জা'ফর ইসলামের পতাকা তুলে নেন, তিনিও শহীদ হয়ে যান। তারপর ইসলামের পতাকা হযরত আবদুল্লাহ্ হাতে নেন, তিনিও শহীদ হয়ে যান।'তাঁর (সা.) চোখ থেকে তখন অশ্রু ঝরছিল; 'তখন ইসলামের পতাকা আল্লাহ্ তা'লার তরবারিসমূহের মধ্য থেকে একটি তরবারি ধারণ করল। (এরপর) আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয় দান করলেন।'

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া মুতাবাসীদের খবর নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) বলেন, 'তুমি যদি চাও তাহলে তুমি আমাকে বলো, আর তুমি চাইলে আমি তোমাকে তাদের ব্যাপারে বলে দিচ্ছি।' অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা খবর দিয়ে দিয়েছেন; তুমি আগে বলতে চাও নাকি আমি তোমাকে বলব যে, কী হয়েছে। তিনি নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে বলে দিন।' তিনি (সা.) তাঁকে সমগ্র ঘটনা বলে দেন। তিনি নিবেদন করেন, 'সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে (সা.) সত্যসহ পাঠিয়েছেন! আপনি (সা.) ঐসব ঘটনা থেকে একটি শব্দও বাদ দেন নি।'

তিনি (সা.) বলেন, 'আল্লাহ্ আমার জন্য ভূমিকে উঁচু করে দিয়েছিলেন, এমনকি আমি তাদের যুদ্ধক্ষেত্র দেখেছি। আমি স্বপ্নে তাদেরকে দেখেছি, তারা সোনার বিছানায় ছিল। আমি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার বিছানা দেখলাম, তার বিছানায় কিছুটা বক্রতা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কী? আমাকে বলা হলো, এই দুজন সোজাসুজি গিয়েছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ কিছুটা দ্বিধা করেছিলেন, তারপর এগিয়ে গিয়েছিলেন।' তার দ্বিধার উল্লেখ পূর্বের খুতবায় করা হয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, প্রথমে আমি যুদ্ধ করব না বলে ভেবেছিলাম।

একটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জা'ফর, যায়েদ এবং ইবনে রাওয়াহাকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, তারা মুক্তার তাঁবুতে ছিল। আমি হযরত যায়েদ এবং হযরত ইবনে রাওয়াহাকে দেখলাম, তাদের ঘাড়ে বাঁকাভাব ছিল, কিন্তু হযরত জা'ফর সোজা ছিলেন, তার মধ্যে কোনো বাঁকাভাব ছিল না। আমাকে বলা হলো, যখন এই দু ইজনের ওপর মৃত্যু আসে তখন তারা এটি এড়াতে চেয়েছিলেন; অর্থাৎ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু হযরত জা'ফর এরূপ করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বাহুর বদলে দুটি ডানা দান করেছেন, তিনি সেগুলোর মাধ্যমে জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর হযরত জা'ফরের পুত্র আবদুল্লাহ্কে সালাম করার সময় বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ অর্থাৎ হে দুই ডানাওয়ালার পুত্র! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৫১-১৫৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি বিস্তারিত বিবরণে কিছু মাসলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:যেসব কঠিন মাসলা রয়েছে, সেগুলো কিছু লোক বুঝতে পারে আর কিছু লোক বোঝেনা। অন্যান্য লোক যারা অবগত থাকে, তাদের উচিত তাদেরকে সেই মাসলাগুলো বুঝিয়ে দেওয়া। তারা হয়ত নিজেরা চিন্তাভাবনা না করার কারণে বুঝে না, অথবা এই কারণে বুঝে না যে, তাদের অন্তর কোনো গুনাহের কারণে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে না। এই কঠিন বিষয়গুলো সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত, জ্ঞানগত বিষয় যা সূক্ষ্ম দর্শনভিত্তিক হয়ে থাকে। যেমন তওহীদ; এর এতটুকু অংশ তো প্রত্যেক ব্যক্তিইবুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ এক। কিন্তু এরপর এই সুফিসুলভ সূক্ষ্মতা যে, কীভাবে মানুষের প্রতিটি কাজে আল্লাহ্ তা'লার তাওহীদের প্রভাব পড়ে– এর জন্য একজন আরেফ তথা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজন হবে এবং এই মাসলাগুলো অন্যদের বোঝানোর জন্য কোনো আলেমের প্রয়োজন হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এসব সূক্ষ্মতা বুঝে না, কিন্তু এতটুকু অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, কুরআন করীম অন্য কোনো খোদার ধারণাকে সমর্থন করে না। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, আল্লাহ্ এক।

"দ্বিতীয়ত, এই সমস্যাগুলো এমন দাবি সম্পর্কে উদ্ভূত হয় যা জ্ঞানগত না হলেও এমন ভাষায় বর্ণিত হয় যাকে উপমা ও রূপক বলে। এগুলো সূক্ষ্ম কোনো জ্ঞানগর্ভ মাসলা নয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ এবং প্রবাদ আছে যা লোকেরা বুঝতে পারে না; সেগুলো যদি ব্যাখ্যা করা হয় তবে কিছু লোক তার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে নেয়। সাধারণ মানুষ সেই ভাষা না জানার কারণে এর এমন অর্থ করে নেয় যা বাস্তবতার ভিত্তিতে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, মহানবী (সা.)-এর সময়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল। যখন সিরিয়ার যুদ্ধে আল্লাহ্র রসূল (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যদি যায়েদ নিহত হন তবে জা'ফর বিন আবি তালেব নেতৃত্ব নেবেন, আর যদি জা'ফর নিহত হন তবে আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব নেবেন। মহানবী (সা.) যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল এবং হযরত যায়েদ, হযরত জা'ফর এবং হযরত আবদুল্লাহ্ তিনজনই শহীদ হয়ে যান। আর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ সেনাবাহিনীকে নিজের নেতৃত্বে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন। যখন মদীনায় এই সংবাদ পৌঁছে, তখন যেসব মহিলার স্বামী নিহত হয়েছিলেন বা যেসব পিতামাতার সন্তান এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, তারা শরীয়তের অনুমোদিত সীমায় থেকে ক্রন্দন আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) শুধু সমবেদনা প্রকাশের জন্য বলেছিলেন; এই উদ্দেশ্যে বলেন নি যে, মহিলারা একত্রিত হয়ে ক্রন্দন আরম্ভ করবে; তিনি বলেছিলেন, 'জা'ফরের জন্য তো কাঁদার কেউ নেই!' তিনি তাঁর (সা.) আত্মীয় ছিলেন, তিনি দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মতে এই বাক্যাংশ দ্বারা তাঁর এই উদ্দেশ্য কখনোই ছিল না যে, জা'ফরের জন্য কেউ ক্রন্দন বা বিলাপ করুক।বরং এটি বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমাদের ভাইও তো এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে; যখন আমরা কাঁদি নি, তখন তোমাদেরও ধৈর্য ধারণ করা উচিত। তিনি (সা.) এটাই বোঝাতে চাইছিলেন, কারণ হযরত জা'ফরের আত্মীয় হয় মহানবী (সা.) ছিলেন অথবা হযরত আলী ছিলেন, এবং তাঁদের মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের পক্ষে আর্ত নাদ করা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্র রসূল (সা.) কিংবা হযরত আলী কারো পক্ষেই চিৎকার করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের জ্ঞান ছিল, সঠিক উপলব্ধি ছিল। আমার ভাই জা'ফরও নিহত হয়েছে, কিন্তু আমি কাঁদি নি– এই কথাটা প্রকাশ করার জন্যই সম্ভবত মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'জা'ফরের জন্য তো কেউ কাঁদছে না!' আনসার যেহেতু মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা পূরণ করার অত্যধিক আগ্রহ রাখতেন,তাই এই কথা শুনে নিজেদের ঘরে গিয়ে মহিলাদের বলেন, 'এখানে কান্নাকাটি করা বাদ দাওএবং জা'ফরের ঘরে গিয়ে বিলাপ করো।' অতঃপর যখন সব মহিলা হযরত জা'ফরের ঘরে একত্রিত হয়ে যায় এবং সবাই একসাথে বিলাপ করে ওঠে তখন মহানবী (সা.) এই আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে?' আনসার নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)!আপনি যেহেতু বলেছিলেন, জা'ফরের জন্য কাঁদার কেউ নেই, তাই আমরা আমাদের মহিলাদের হযরত জা'ফরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং তারা কাঁদছে।' তিনি (সা.) বলেন, 'আমার কথার অর্থ তো এটা ছিল না! যাও, তাদের নিষেধ করো। আমার (কথার) উদ্দেশ্য ছিল, আমরা কাঁদি নি, তাই তোমরাও ধৈর্য ধারণ করো।' অতএব একজন লোক যায় এবং তাদের নিষেধ করে। মহিলারা সেই ব্যক্তিকে বলে, 'তুমি আমাদেরকে বারণ করার কে? মহানবী (সা.) তো আজ পরিতাপের সাথে বলেছেন, জা'ফরের জন্য তো কাঁদার কেউ নেই! আর তুমি আমাদেরকে

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

কান্না করতে নিষেধ করছো?' তাদের এই উত্তর শুনে সে পুনরায় মহানবী (সা.)-এর নিকট যায়। কেননা কোনো কোনো মানুষের মাঝে সামান্য কথাও পৌঁছানোর অতিশয় আগ্রহ থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তারা যখন এ কথা বলে তখন সে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করে, 'তারা আমার কথা মানছেনা।' তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'তাদের মাথায় মাটি ঢেলে দাও।' এটি একটি প্রবাদ। এ কথার অর্থ হলো, বাদ দাও, তাদেরকে আর কিছু বলো না; তারা নিজেরাই কান্নাকাটি করে চুপ হয়ে যাবে। (আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন,) সে নিজের চাদরে মাটি নিয়ে সেই কথাকে আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ করতে থাকে আর সেই মহিলাদের মাথায় মাটি দিতে শুরু করে। তখন তারা তাকে বলে, 'এই পাগল! করছ কী?' তখন সে বলে, 'মহানবী (সা.) আমাকে তোমাদের মাথায় মাটি ঢালতে বলেছেন, তাই আমি তো মাটি দিয়েই ছাড়ব!' এটি একটি রূপক কথা ছিল, সে এই কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে বাস্তবায়ন করতে আরম্ভ করে। হযরত আয়েশা (রা.) যখন একথা জানতে পারেন তখন তাকে ভর্ৎ সনা করেন এবং বলেন , 'তুমি তো কথা বুঝতেই পারো নি! মহানবী (সা.)-এর এ কথার অর্থ হলো, তাদেরকে উপেক্ষা করো, তারা নিজেরাই চুপ হয়ে যাবে। তাঁর কথার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, তুমি তাদের ওপর মাটি ঢালতে আরম্ভ করবে।' অতএব এটি মহানবী (সা.)-এর একটি রূপক কথা ছিল, কিন্তু সে আক্ষরিক অর্থেই মাটি দিতে শুরু করে দেয়। সুতরাং অনেক সময় লোকেরা রূপক কথা বোঝার চেষ্টা করে না। এখন এখানে দেখুন, একজন পুরুষ হয়েও সে এই কথাটি বুঝতে পারে নি,কেননা তার মধ্যে এতটা বুদ্ধি ছিল না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) তাকে এটি বুঝালেন। এভাবে অনেক সময় কথার আক্ষরিক অর্থ করা বাস্তবতা পরিপন্থী হয়ে থাকে আর এভাবে কথা অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।"

(ফাযায়েলুল কুরআন (৬) আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৪, পৃ: ৩৫১-৩৫৩)

এই ঘটনা থেকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সাহাবীদের ভালোবাসার বিষয়টিও প্রকাশ পায়, যেটিকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে অন্যত্র এভাবে বর্ণনা করেছেন: সাহাবীরা যে বিলাপ করার জন্য নিজ স্ত্রীদের হযরত জা'ফর (রা.)-র বাড়িতে পাঠালেন- এই ঘটনার মাধ্যমে সাহাবীদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তারই বহিঃপ্র কাশ ঘটে। তাঁর উক্তি তাদেরকে এই কথা ভাবার অবকাশ দেয় নি যে,মহানবী (সা.) আসলে কি চাইছেন; বরং তারা দ্রুত তাদের স্ত্রীদের বললেন, নিজেদের দুঃখ ভুলে গিয়ে তোমরা মহানবী (সা.)-এর সমব্যথী হও। এই ঘটনা দ্বারা তোমরা অনুধাবন করতে পারবে, তাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি কতটা ভালোবাসা ছিল! অর্থাৎ তারা মহানবী (সা.)-এর এই কথা শোনামাত্র যে 'জা'ফরের ঘর থেকে তো কোনো কান্নার শব্দ আসছে না'- তারা ভাবেন, নিজেদের আত্মীয়স্বজনের শাহাদাতের জন্য কান্না করে তারা ভুল করেছেন; প্রকৃত দুঃখ তো সেটিই, যে দুঃখ পেয়েছেন স্বয়ং মহানবী (সা.)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বাহ্যত এটি একটি ছোটো ঘটনা মনে হতে পারে, কিন্তু অনুভূতি প্রকাশের দিক থেকে এর চেয়ে ভালো উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যাবে। এরা ছিলেন সেসব লোক যাদের সেবাসমূহ সরাসরি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সামনে ছিল। তাদের কুরবানী ও আত্মত্যাগ মহানবী (সা.)-এর চোখের সামনে সবসময় বিরাজমান থাকত। আর তারা এমন ভালোবাসা মহানবী (সা.)-এর প্রতি পোষণ করতেন, যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোনো সম্পর্কে খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব যদি পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, যদি আবেগ-অনুভূতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয়, তবে মহানবী (সা.)-এর উচিত ছিল তাদের অনুভূতির অধিক কদর করা এবং আমরা যারা বহু যুগ পরে এই দুনিয়ায় এসেছি, তাদের তুলনায় আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কম হওয়া উচিত ছিল। কারণ আমরা তো একেবারে পরবর্তী যুগের মানুষ। আমাদের প্রতি ভালোবাসা তো খুবই কম হওয়ার কথা ছিল। তারা তো সর্বদা মহানবী (সা.)-এর সম্মুখেই থাকতেন এবং ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর অসীম ভালোবাসা- মানবীয় ভালোবাসার জন্য যতটা অসীম হওয়া সম্ভব, তা তাঁকে কখনোই এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হতে দেয় নি, যার ফলে পরবর্তীদের মনোবল হারিয়ে যেতে পারে। তিনি তোমাদের মনোবল কখনো হ্রাস পাওয়ার সুযোগ দেন নি।অর্থাৎ এ যুগে আমরা যারা আছি, আমাদের মনোবলকে দুর্বল হতে দেন নি। বরং মহানবী (সা.)-এর মমতা ও ভালোবাসা এটিও পছন্দ করে নি যে, সেই মধ্যবর্তী (যুগের) উম্মতের মনোবলও ক্ষুণ্ন হবে। যেমন, এক বৈঠকে তিনি (সা.) পরবর্তীতে আগমনকারীদের উল্লেখ এই ভাষায় করেছেন, আমার ভাইয়েরা যারা আমার পরে আসবে, তারা এমন হবে। সাহাবীরা এটি শুনে ঈর্ষান্বিত হন। তারা নিবেদন করেন, তারা আপনার ভাই, আমরা কি আপনার ভাই নই? আমরা আপনার সাথে থাকি! আপনি আমাদেরকে ভাই বলেন নি, আর যারা পরবর্তীতে আগমন করবেন তাদেরকে আপনি নিজের ভাই বলছেন! মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা আমার সাহাবী আর তারা আমার ভাই। তোমাদের জন্য কি এটি সামান্য কোনো নেয়ামত যে, তোমরা আমাকে দেখছ এবং আমার সাথে থেকে ধর্মের কাজ করছ! এটি অনেক বড়ো নেয়ামত যা তোমরা লাভ করেছ। আর পরবর্তীতে আগমন করার ফলে যারা আমাকে দেখবে না এবং যারা আমার পরে আগমন করবে- তাদের সম্পর্কেও তো আমাকে কিছু কথা বলতে দাও! তাদের সম্পর্কে কী বাক্য ব্যবহার করব যেন তারাও আশ্বস্ত হতে পারে। এভাবে তিনি (সা.) পরবর্তীতে আগমনকারীদের মনোবল দৃঢ় করেছেন। অতএব দেখো, মহানবী (সা.) কীভাবে তোমাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন! তিনি (সা.) বলেছেন, আমি জানি না, আমার উম্মতের প্রথমাংশ শ্রেষ্ঠ নাকি শেষাংশ শ্রেষ্ঠ।

(খুতবাতে শুরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৫-৫০৭)

মুতার শহীদদের সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীরের গ্রন্থ 'বিদায়া ওয়া নিহায়া'তে আরো কিছু বর্ণনা এসেছে। মুতার শহীদদের সম্পর্কে উল্লেখ করার পর (তিনি) লিখেছেন, সেই শহীদদের সংখ্যা ছিল বারো। কতক রেওয়ায়েতে শহীদদের সংখ্যা আরো বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যা-ই হোক, এটি অনেক বড়ো নিদর্শন যে, দু টি সৈন্যদল মুখোমুখি হয়েছে; যারা খোদার পথে লড়াই করছে সেই পক্ষের সংখ্যা তিন হাজার আর বিরোধী পক্ষের সৈন্য সংখ্যা দুই লক্ষ; এক লক্ষ রোমান আর এক লক্ষ খ্রিষ্টান। তারা পরস্পর রণাঙ্গণে মুখোমুখি হলো। তবুও মুসলমানদের শুধুমাত্র বারোজন সদস্য শহীদ হয়েছেন বা অনেক কম সংখ্যক সদস্য শহীদ হয়েছেন আর মুশরিকদের বৃহৎ সংখ্যক জাহান্নামে পৌঁছেছে। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, (শুধুমাত্র) একা আমার হাতেই সেদিন নয়টি তরবারি ভেঙেছে। একটি ইয়েমেনি তরবারি ছিল যেটি আমার হাতে অক্ষত থাকে। সেসব তরবারির মাধ্যমে কতগুলো মুশরিক জাহান্নামে পৌঁছে থাকবে!

মুসলমানদের মদীনায় প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে এবং মহানবী (সা.)-এর তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়ে লিখিত আছে, মুসলমানরা প্রত্যাবর্তনকালে এক জনপদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন যেখানে একটি দু র্গ ছিল। (লোকালয়) অতিক্রমকালে এখানকার বাসিন্দারা একজন মুসলমানকে শহীদ করে দিয়েছিল। মুসলমানরা তাদের অবরোধ করেন,পরিশেষে তারা তা জয় করেন। হযরত খালিদ (রা.) তাদের সর্দারদের হত্যা করেন। মুসলমানরা যখন মুতা থেকে ফিরে আসেন তখন মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানান। তারা ফিরে আসলে কতিপয় মানুষ (সৈন্যদলের) প্রতি ভীষণ ক্রোধান্বিত ছিল যে, তারা শহীদ হয়ে কেন ফিরল না! এটি তো কোনো বিজয় হলো না। কতিপয় মানুষ সেনাদলের ওপর মাটি নিক্ষেপ করে বলতে লাগল, ওহে পলায়নকারীরা! তোমরা আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে পালিয়ে এসেছ। অর্থাৎ তাদেরকে বিদ্রুপ করে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, এরা পলায়নকারী নয়, বরং পুনঃ পুনঃ আক্রমণকারী, অর্থাৎ ফিরে গিয়ে আক্রমণকারী।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মুসলমানরা যখন মুতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমিও তাদের সাথে ছিলাম। অপর এক রেওয়ায়েতে তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা লজ্জিত ছিলাম যে, আমরা পলায়নের পথ অবলম্বন করেছি। আমাদের এটি ধারণা ছিল, আমরা সেই (স্থান) ত্যাগ করে চলে এসেছি। অথচ শত্রুরা তো সেখান থেকে নিজেরাই পিছু হটে গিয়েছিল। তারা তাদের পিছু ধাওয়া করেন নি, বরং তারা এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং ফেরত চলে আসেন। এটি বেশ ভালো বুদ্ধিবৃত্তিপূর্ণ কাজ ছিল, কিন্তু এটিকে কিছু মানুষ পলায়ন জ্ঞান করেছে। তিনি বলেন, আমরা একথা ভেবে লজ্জিত ছিলাম যে, আমরা পালানোর পথ অবলম্বন করেছি। আমরা বললাম, আমরা যদি মদীনায় চলে আসি তাহলে আমাদেরকে হত্যা করা হবে। তাই আমরা রাতের বেলায় মদীনায় প্রবেশ করে আত্মগোপনে চলে যাই। কিছু মানুষ এতটাই লজ্জিত ছিল যে, রাতে প্রবেশ করে এবং লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি বলেন, আমরা ভাবলাম, আমরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তিনি (সা.) যদি তওবা কবুল করেন তো ভালো, অন্যথায় আমরা চলে যাব। অর্থাৎ পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে চলে যাব অথবা সেখান থেকে চলে যাব। আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর সকাশে হাজির হই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? আমরা উত্তরে বলি, পলায়নকারীরা। তারা নিজেরাই লজ্জিত ছিলেন, তাই নিজেরাই বলেন, যারা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে- আমরাই তারা। তিনি (সা.) বলেন, না, তোমরা তো পালটা আক্রমণকারী দল, আমিও তোমাদের দলে। অথবা তিনি (সা.) বলেন, আমি সব মুসলমানের দলভুক্ত। এটি শুনে আমরা তাঁর (সা.) হাত চুম্বন করি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৫৪-১৫৬) (গাযওয়াতু নবী, প্রণেতা-আবুল কালাম আজাদ, পৃ: ১৭৭)

মহানবী (সা.) অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করেন।

এরপর আরেকটি যুদ্ধাভিযান রয়েছে যা হযরত আমর বিন আস-এর অভিযান

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

নামে অভিহিত। এ যুদ্ধাভিযান ৮ম হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, এ যুদ্ধাভিযান ৭ম হিজরীতে হয়েছিল। ইবনে ইসহাক ছাড়া বাকি সবাই এ বিষয়ে একমত যে, এ যুদ্ধাভিযান মুতার যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল আর মুতার যুদ্ধ ৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধাভিযানের কারণ ছিল, মহানবী (সা.) সংবাদ পান, বনু কুযাআ কাতানীদের একটি দল ছিল যারা মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে একত্রিত হচ্ছে। বনু কুযাআ ছিল কাতানীয়দের একটি গোত্র– যা মদীনা থেকে দশ দিনের দূরত্বে আলকুরা উপত্যকায় অবস্থান করত।

এ সম্বন্ধে আরো বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে হযরত আমর বিন আস (রা.)–কে প্রেরণ করেন। হযরত আমর বিন আস মক্কার একজন সর্দার আস বিন ওয়ায়েল–এর পুত্র। তিনি এক বর্ণনামতে ৭ম হিজরীতে এবং আরেক বর্ণনামতে ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আমর বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে কাপড়চোপড় এবং অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নেবার জন্য বার্তা পাঠান। আর তিনি (সা.) বলেন, হে আমর! আমি তোমাকে একটি সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করতে চাই যাদেরকে আল্লাহ্ গনিমতও দান করবেন এবং তোমাদের সুরক্ষাও করবেন। হযরত আমর নিবেদন করেন, আমি ধনসম্পদের লালসায় তো ইসলাম গ্রহণ করি নি। মহানবী (সা.) বলেন, পুণ্যবান মানুষের জন্য হালাল ধনসম্পদ কত–না উত্তম! তুমি এজন্য ইসলাম গ্রহণ কর নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যদি সম্পদ দান করেন তবে তা অনেক উত্তম। মহানবী (সা.) হযরত আমর (রা.)–র নেতৃত্বে মুহাজির ও আনসারের সমন্বয়ে তিনশ সেনা প্রস্তুত করেন যাদের মাঝে ৩০জন অশ্বারোহী ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আমর (রা.)–র জন্য একটি সাদা রঙের পতাকা বাঁধেন এবং সেই সাথে একটি কালো রঙের পতাকাও প্রদান করেন। মহানবী (সা.) হযরত আমরকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, পথিমধ্যে বনু বালী উযরা বালকায়ন–এর কেউ যদি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে তাদেরকে নিজের সাথে নেওয়ার চেষ্টা করবে।

হযরত আমর যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা রাখতেন এবং রণকৌশলেও তার নৈপুণ্য ছিল। মহানবী (সা.) তাকে তার যুদ্ধ–পারঙ্গমতার কারণে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। (শারাহ যুরকানি আলা মোয়াহেবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৭,৩৫৯,৩৬১) (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩২) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৩৭)

হযরত আমর (রা.)–কে এই যুদ্ধাভিযানে প্রেরণের একটি কারণ হলো, তার দাদি বালী গোত্রের সদস্যা ছিলেন, তাই বনু বালীর সাথে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি একটি উত্তম মাধ্যম হতে পারতেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৭৯)

ইসলামী সৈন্যবাহিনী যাত্রা আরম্ভ করল। এরা রাতে সফর করত এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত। ইত্যবসরে তারা জুযাম গোত্রে অবস্থিত সালাসিল নামক ঝরনার নিকটে পৌঁছে যান। এই ঝরনার কারণে এ যুদ্ধাভিযানকে 'সারিয়্যা যাতে সালাসিল'–ও বলা হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১৬৭)

মদীনা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানরা যখন ঝরনার নিকটে পৌঁছায় তখন জানতে পারে, শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি। হযরত আমর (রা.) অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য হযরত রাফে বিন মুকাইসকে মহানবী (সা.)–এর নিকট প্রেরণ করেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবু উবায়দা বিন জাররাহর জন্য একটি পতাকা তৈরি করেন এবং দু –শো মুহাজির ও আনসারের একটি সৈন্যদল তার সাথে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)–ও তাদের সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা (রা.)–কে প্রেরণ করার সময় নসীহত করে বলেন, সেখানে পৌঁছে তোমরা হযরত আমরের সাথে যুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ বাহিনী গঠন করবে এবং নিজেদের মাঝে কোনো ধরনের মতবিরোধ তৈরি করবে না। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন দুই দল একতাবদ্ধ থাকে এবং নিজেদের মাঝে যেন কোনো মতবিরোধ তৈরি না করে। আর হযরত আমর (রা.) তাদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে, একবার মুসলমানরা আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ জড়ো করেন যেন তারা শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আগুনের তাপ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু হযরত আমর (রা.) তা করতে বারণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত আমর (রা.) যখন আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেন তখন হযরত উমর (রা.) খুবই রাগান্বিত হন এবং তার (রা.) কাছে যেতে চান, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাকে থামিয়ে দেন এবং বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার রণনৈপুণ্যের কারণে তাকে আমীর বানিয়েছেন।

(শারাহ যুরকানি আলাল মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৯–৩৬১) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৬৮)

হযরত আমর (রা.) যখন ফিরে আসেন তখন তিনি মহানবী (সা.)–কে বলেন, আমি এজন্য আগুন জ্বালানো অপছন্দ করার কারণ হলো, শত্রুরা আমাদের স্বল্প সংখ্যা দেখতে পেয়ে যেন অতিরিক্ত সৈন্যদল নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে না বসে। মহানবী (সা.) তখন তার (রা.) এই বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৯)

যাইহোক, বিস্তারিত বিবরণে লেখা আছে, মুসলমানরা সেখান থেকে যাত্রা করে শত্রুদের অঞ্চলে পৌঁছে তাদেরকে পদদলিত করে এবং তাদের ওপর বিজয় লাভ করে। মুসলমানরা যখন সেই স্থানে পৌঁছায় যেখানে শত্রুদের জড়ো হবার সংবাদ ছিল, শত্রুরা সেসময় মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যায় এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে শত্রুপক্ষের একটি ছোটো দলের সাথে তাদের লড়াই হয়। মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাভূত করে আর বাকিরা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন আর যেখানেই শত্রুদের কোনো দলের অবস্থানের সংবাদ শুনতে পেতেন সেখানেই অশ্বারোহীদের প্রেরণ করতেন আর তারা তাদের (তথা শত্রুদের) মোকাবিলা করত এবং তাদের উট, ছাগল ইত্যাদি নিয়ে ফেরত আসত। মুসলমানরা মদীনায় ফেরত আসার জন্য রওয়ানা হয়। হযরত আমর (রা.) হযরত অওফ বিন মালেক আশজায়ী (রা.)–কে মহানবী (সা.)–এর নিকট আগে প্রেরণ করেন যেন তিনি মহানবী (সা.)–কে তাদের নিরাপদে ফিরে আসা এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করতে পারেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৬৮)

আরেকটি যুদ্ধাভিযানের নাম হলো হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ। ৮ম হিজরীর রজব মাসে এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এমএ (রা.) তার পুস্তকের শেষাংশে যেসব শিরোনাম প্রস্তাব করেছেন সে অনুযায়ী ৮ম হিজরীর ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হযরত আবু উবায়দা (রা.)–র এই যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা–সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৪৪০)

এই যুদ্ধাভিযানের অন্যান্য নামও রয়েছে। একে 'সারিয়্যা সীফুল বাহর' এবং 'সারিয়্যা খাবাত'–ও বলা হয়। সীফুল বাহর অর্থ সমুদ্র উপকূল। এই যুদ্ধাভিযানে যেহেতু সাহাবীরা লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থান করেছিলেন সেজন্য এই যুদ্ধাভিযানকে সীফুল বাহর বলা হয়। একে 'সারিয়্যা খাবাত' অর্থাৎ 'পাতা খাওয়ার অভিযান' বলা হয়, কেননা এ যুদ্ধে এমন একটি মুহূর্ত এসেছিল যখন সাহাবীরা গাছের পাতা খেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই অভিযানটির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। মহানবী (সা.) তাঁকে ৩০০জন মুহাজির ও আনসার সাহাবীর একটি দলসহ বনু জুহাইনার একটি শাখার দিকে পাঠিয়েছিলেন। এই অভিযানে হযরত উমর (রা.)–ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বনু জুহাইনা নামক গোত্রটি 'কাবালিয়া' নামক স্থানে বসবাস করত। এই স্থানটি মদীনা থেকে প্রায় পাঁচ রাতের দূরত্বে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, মক্কার কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা, যেটি শস্য নিয়ে সিরিয়া থেকে সমুদ্রের পাশ ঘেঁষে মক্কা যাচ্ছিল, তার উপর জুহাইনা গোত্রের পক্ষ থেকে হামলার আশঙ্কা ছিল। এটি হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়কার ঘটনা। যেহেতু জুহাইনা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর মিত্র, তাই তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সতর্কতামূলকভাবে একটি নিরাপত্তা দল পাঠিয়ে দেন যেন সিরিয়া থেকে আগত কাফেলার ওপর কোনো হামলা না হয় এবং কুরাইশের হাতে চুক্তি লঙ্ঘনের অজুহাত না আসে। এই বাহিনী পাঠানো হয়েছিল কুরাইশের কাফেলাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য, যেন পথিমধ্যে বসবাসরত জুহাইনা গোত্র কোনো আক্রমণ না করে। কারণ হুদাইবিয়ার চুক্তি হয়ে গিয়েছিল এবং এই নতুন চুক্তি অনুযায়ী সকলের তা মেনে চলা আবশ্যক ছিল। তাই রসূলুল্লাহ্ (সা.) ৩০০জনের একটি দল পাঠালেন যেন তারা কুরাইশ কাফেলাকে নিরাপদে পথ অতিক্রমে সহায়তা করে।এ থেকে স্পষ্ট হয়, এই সাহাবীরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে যান নি। তাই ১৫ দিনেরও বেশি সময় অবস্থান করা সত্ত্বেও কোনো যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭৬) (বুখারী, ৯ম খণ্ড, পৃ:২৩৯)

এই অভিযানে রওয়ানা হওয়া এবং রাস্তায় খাবার শেষ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে একটি বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। হযরত জাবের (রা.) এই অভিযানের বিষয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের পাঠিয়েছিলেন। আমরা ছিলাম ৩০০জন অশ্বারোহী এবং আমাদের নেতা ছিলেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)। আমরা রওয়ানা হলাম এবং কিছুদূর যেতেই আমাদের খাবার পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন হযরত আবু উবায়দা যার কাছে যা খাবার ছিল সব একত্র করার নির্দেশ দেন। একত্র করার পর দেখা গেল, আমাদের কাছে মাত্র দুই থলে খেজুর রয়েছে। হযরত আবু উবায়দা আমাদের প্রতিদিন অল্প অল্প করে

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

খেজুর খেতে দিতেন, অবশেষে তা-ও শেষ হয়ে গেল। এরপর আমাদের প্রতিদিন মাত্র একটি খেজুর করে দেওয়া হতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত জাবেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, একটি খেজুরে কীভাবে তোমাদের ক্ষুধা মিটতো? তিনি বলেন, যখন সেটিও পাওয়া বন্ধ হলো, তখনই বুঝতে পারলাম একটিমাত্র খেজুরও কত মূল্যবান ছিল। [একসময় যখন আমাদের কাছে আর কিছুই থাকল না, তখন সেই একটি খেজুরই আমাদের কাছে অমূল্য মনে হতে লাগল।] আরেক বর্ণনামতে, হযরত জাবের বলেন, আমরা সারাদিন সেই একটি খেজুর চুষে চুষে খেতাম, তারপর পানি পান করতাম। রাত পর্যন্ত সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

হযরত জাবের বলেন, আমরা কুরাইশের বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করার জন্য সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে অবস্থান করি। আমরা প্রায় আধা মাস সেখানে ছিলাম এবং চরম ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। এমনকি আমরা গাছের পাতা পর্য ন্ত খেয়েছি। এই কারণে এই বাহিনীর নাম রাখা হয় 'জাইশুল-খাবাত' অর্থাৎ 'পাতা ভক্ষণকারী বাহিনী'। আমাদের এই খাদ্যাভ্যাসের কারণে আমরা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, আমাদের ঠোঁট ও মুখের চারপাশে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এক ব্যক্তি বলেছিল, যদি এই অবস্থায় শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হতো, তবে এই দুর্দশার কারণে যুদ্ধ তো দূরের কথা, আমরা নড়াচড়াও করতে পারতাম না!

খাদ্যের জন্য উট জবাইয়ের বিষয়েও একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত জাবের বলেন, আমাদের বাহিনীতে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি সবাইকে খাওয়ানোর জন্য তিন দিন যাবৎ প্রতিদিন তিনটি করে উট জবাই করেন। এরপর হযরত আবু উবায়দা তাকে তা বন্ধ করতে বলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭৬)(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৬০, ৪৩৬১, ৪৩৬২)

সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলি থেকে জানা যায়, এই ব্যক্তি ছিলেন হযরত কায়েস বিন সা'দ। হযরত কায়েস বিন সা'দ বলেন, কে আমার কাছে খেজুরের বিনিময়ে উট বিক্রি করবে? উট আমি এখানেই জবাই করব, কিন্তু এর দাম মদীনায় ফিরে গিয়ে পরিশোধ করব। অর্থাৎ সাহাবীদের ক্ষুধার তীব্রতা দেখে তিনি বলেন, আমি উট ক্রয় করব এবং এখানে জবাই করে তোমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করব। হযরত উমর (রা.) উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলেন, এই ছেলে বড়োই অদ্ভুত! তার নিজের কাছে তো কোনো সম্পদ নেই, আবার অন্যের সম্পদের বিষয়ে নাক গলায়। বাড়িতে গিয়ে কীভাবে দাম দেবে? এর কাছে নিজের তো কোনো বাগান নেই। হযরত কায়েসের সাথে জুহাইনার এক ব্যক্তির দেখা হয়। তিনি (রা.) সেই ব্যক্তিকে বলেন, আমার কাছে উট বিক্রি করো। সেখানকার গোত্র থেকে তিনি একটি উট ক্রয় করে বলেন, আমি মদীনায় গিয়ে খেজুর দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ করে দেবো। সেই ব্যক্তি বলেন, তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না। হযরত কায়েস বলেন, আমি কায়েস বিন সা'দ বিন উবায়দা। লোকটি বলল, তুমি তোমার বংশ পরিচয় দিয়ে আমাকে চিনিয়ে দিলে। আমার ও মদীনার নেতা সা'দের মধ্যে তো বন্ধুত্ব রয়েছে ; আমরা পরস্পর বন্ধু। হযরত কায়েস তার থেকে পাঁচ ওয়াসাক খেজুরের বিনিময়ে পাঁচটি উট ক্রয় করেন, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতশ কিলোগ্রাম খেজুরের বিনিময়ে। সেই ব্যক্তি বলল, তুমি সাক্ষী আনো।[কোনো জামিনদারও তো থাকা উচিত।] তখন কয়েকজন মুহাজির ও আনসারী সাহাবী তার পক্ষে সাক্ষী হয়ে যান। হযরত উমর এ মর্মে সাক্ষী হতে অস্বীকৃতি জানান যে, এই সম্পদ তো তার নিজের না, বরং তার পিতার। অর্থাৎ যে খেজুরের কথা সে বলছে, সেই খেজুরের বাগান তার পিতার; সে কীভাবে দাম দেবে? যাহোক, এই সেনাবাহিনী যখন মদীনা ফেরত আসে তখন হযরত সা'দ হযরত কায়েসকে জিজ্ঞেস করেন, সাহাবীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিল তখন তুমি কী করেছ? তিনি বলেন, আমি উট জবাই করেছিলাম। হযরত সা'দ বলেন, এরপর কীকরেছ? হযরত কায়েস বলেন, এরপর আমি আবারও উট জবাই করি। হযরত সা'দ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, এরপর কী করেছ? হযরত কায়েস বলেন, এরপর আমি আবারও উট জবাই করি। হযরত সা'দ জিজ্ঞেস করেন, এরপর কী করেছ? হযরত কায়েস বলেন, এরপর আমাকে নিষেধ করা হয়। হযরত সা'দ জিজ্ঞেস করেন, কে নিষেধ করেছিল? হযরত কায়েস বলেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.)! হযরত সা'দ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কেন নিষেধ করেছিল? হযরত কায়েস বলেন, কারণ আমার কোনো সম্পদ নাই, বরং যা আছে তা আমার বাবার। হযরত সা'দ বলেন, আমি তোমাকে চারটি বাগান দিচ্ছি। [তার পিতা এতে খুশি হন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে চারটি বাগান দিয়ে দিচ্ছি।] এর মাঝে সবথেকে নিম্ন মানের বাগান থেকেও তুমি কমপক্ষে পঞ্চাশ ওয়াসাক খেজুর পাবে। [অর্থাৎ বিপুল পরিমাণ, কয়েকশ কিলোগ্রাম খেজুর।] হযরত সা'দ একটি দলিল লিখে দেন এবং এতে আবু উবায়দা (রা.)-সহ অন্যান্য ব্যক্তিদের সাক্ষী রাখেন। বনু জুহাইনার সেই ব্যক্তিও কায়েসের সাথে মদীনাএসেছিল। হযরত সা'দ তাকে খেজুর দেন, বাহন দেন এবং কাপড় পরিধান করান। হযরত জাবের বলেন, মহানবী (সা.) যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, দানশীলতা তো এই পরিবারের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ, পৃ: ১৭৭, ১৭৮) (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪৮, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭)

হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এই ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, সাহাবায়ে কেরামের কঠিন ক্ষুধার সময়েও অসীম ধৈর্য প্রদর্শন করা এবং কোনো কাফেলা বা জনপদের প্রতি খাদ্যের জন্য কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ না করা একথারপ্রমাণ বহন করে যে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য কোনো যুদ্ধ ছিল না। আর তাদের পবিত্র আত্মা কোনো অন্যায় বা জুলুমকে বৈধ মনে করত না। (বুখারী, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৪০)

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা সেই সময়ে সেখানে তাদের ক্ষুধা মেটানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করেছিলেন।

এ সম্পর্কে লেখা আছে:হযরত জাবের এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, সমুদ্র আমাদের জন্য একটি বড়ো টিলার ন্যায় মাছ যাকে আমবার বলা হয়, সমুদ্র থেকে বাহিরে নিক্ষেপ করে। এই আমবার অনেক বড়ো মাছ যাকে তিমি মাছও বলতে পারেন। আল্লামা যুহরী বলেন, আমবার সমুদ্রের অনেক বড়ো একটি মাছ, যার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ গজ পর্য ন্তহয়ে থাকে। হযরত জাবের (রা.) বলেন, এর (অর্থ াৎ তিমি মাছের) মাংস আমরা ১৫ দিন বা অপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আঠারো দিন অথবা এক মাস পর্যন্ত খেয়েছি। সেখানে অবস্থান ও ফেরত আসার আগ পর্য ন্ত আহার করেছি আর এর চর্বি শরীরের মালিশ করেছি, যার ফলে আমাদের শরীর আগের মতো সতেজ হয়ে যায়; ক্ষুধার কারণে (শারীরিক) যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়ে যায়। হযরত জাবের (রা.) বলেন, সেই মাছে র চোখ বড়ো বড়োকলসির মত ছিল। আমরা তা থেকে কয়েক কলসি তেল সংগ্রহ করেছি এবং তার দেহ বড়োবড়ো টুকরো কেটেছি, কিছু অংশ বাজারে নিয়ে বিক্রিও করেছি।

(কিতাবুল আতইমা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩৯৮)

সেই মাছের চোখের কোটরের ভেতর বসার বিষয়ে দুই ধরনের রেওয়ায়েত বিদ্যমান। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা মোট ছয়জন মাছের চোখে (অর্থাৎ অক্ষিগোলকের কোটরে) বসেছিলাম, যদিও আরেক রেওয়ায়েতে ত্রিশ ব্যক্তির বসার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ (রা.) মাছের পাঁজরের একটি হাড় এবং অপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী দুটি পাঁজরের হাড় নিয়ে দাঁড় করান এবং (আমাদের মধ্যে) সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তি হযরত কায়েস (রা.)-কে সবচেয়ে উঁচু উটে বসিয়ে দেন আর তারা উভয়েই অনায়াসে এর পাঁজরের হাড়ের মধ্য দিয়ে হাড় স্পর্শ করা ছাড়াই পার হয়ে যান।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে লিখা রয়েছে, হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা যখন মদীনায় ফিরে এলাম তখন আমরা মহানবী (সা.)-এর নিকট সেই মাছের গল্প শোনালাম। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে আহার করো, আর তোমাদের কাছে যদি কিছু রয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাকেও খাওয়ার জন্য দাও। তাদের মধ্য থেকে কেউ একজন তাঁকে (সা.) অল্প একটু দিলে তিনি (সা.) তা খেয়ে নেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৬০.৪৩৬১,৪৩৬২) (ফাতহুল বারি, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১০০) (সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭০)

এই যুদ্ধের বিবরণ এখানে শেষ হচ্ছে। আমার চেষ্টা ছিল এটি দ্রুত শেষ করার যেন অন্য (নতুন) বিষয়বস্তু (নিয়ে আলোচনা) আরম্ভ করা যায়। কিন্তু কতক জানাযা ও শহীদদের স্মৃতিচারণের বিষয়ও মাঝে মাঝে আসতে থাকে। এখনো এর কিছুটা অংশ বাকি রয়ে গেছে, সবশেষে মক্কা বিজয়ের আলোচনাও করা হবে। যাহোক, (যুদ্ধাভিযান নিয়ে) এই আলোচনাএখনো চলমান রয়েছে। কিন্তু আজ আমি এটিও উল্লেখ করতে চাই, গত শুক্রবারও আমি বলেছিলাম, পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে বিরাজমান যুদ্ধের পরিস্থিতি সামনে রেখে অনেক বেশি দোয়া করুন যেন তাদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও মীমাংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।কারণ

এরপর ১০ পাতায়...

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Noor Jahan Begum, Kolkata

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুদ্ধের ময়দানে মহানবী (সা.)-এর উন্নত আচরণ ও আদর্শ

মহম্মদ ইনাম গৌরি সাহেব, নাযের আলা কাদিয়ান অনুবাদক: রফিক আহমদ মোল্লা, মুবাল্লিগ সিলসিলা

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

(আল আহযাব: ২২) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে রয়েছে উৎকৃষ্ট আদর্শ।

(সূরা আল কালাম: ৫)

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এবং নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।

শ্রোতাবৃন্দ! সৈয়্যদানা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উত্তম নৈতিকতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল, তিনি (সা.) যথাসম্ভব যুদ্ধ বিগ্রহ এড়িয়ে চলতেন এবং সর্বদা শান্তির পথ অবলম্বন করতেন। মক্কী যুগের তেরো বছর তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের দুঃখ-দুর্দশা এবং মক্কার কাফেরদের অত্যাচার ও বর্বরতার দুর্বিষহ কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ। যখনই সাহাবীগণ অত্যাচার নিপীড়নের অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর কাছে আসতেন, তখন তিনি (সা.) উত্তরে বলতেন- اِنِّيْ اُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوْا অর্থাৎ আমাকে ক্ষমা ও উদারতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই তোমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকো।

এতদ্‌সত্বেও মক্কার কাফেরদের নিপীড়ন যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং মহানবী (সা.)-এর আগমণের মুখ্য উদ্দেশ্য একত্ববাদের প্রচারের সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে হিজরত করার অনুমতি দেন। আল্লাহ্ স্বীয় তদারকি, সঙ্গ ও সুরক্ষার বলয়ে বেষ্টন করে তৎকালে ইয়াসরিব নামের মদীনাতে পৌঁছে দেন, যাতে তিনি (সা.) স্বাধীনভাবে একত্ববাদের বাণী প্রচার করতে পারেন। কিন্তু মক্কার কাফেররা কখনোই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যে, মহানবী (সা.)-এর ঐশী কর্মকাণ্ডের বার্তা মদীনার বলয় হতে বের হয়ে সমগ্র আরবে বিস্তার লাভ করুক আর এই কর্মকাণ্ড ব্যর্থ করতে তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে থাকে।

অতএব, তারা স্বীয় কল্পনায় ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে মদিনা থেকে উৎখাত করে চিরতরের জন্য ধ্বংস করার বাসনায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অস্ত্রাদি সহযোগে মদিনায় আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তখন আল্লাহ্ তা'লা নিপীড়িত মুসলমানদের আত্মরক্ষা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তরবারির প্রতিপক্ষতায় তরবারি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন, অথচ মুসলমানদের কাছে যুদ্ধের কোন সাজ সরঞ্জাম পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (আল-হজ্জ: ৪০) চিন্তা কর না, আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

মদিনায় হিজরতে এক বছর পর ২য় হিজরির রমযান মাসে মক্কার কাফেররা এক হাজার যুদ্ধংদেহী সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে। এই লোকেরা তৎকালে ব্যবহৃত যুদ্ধ সরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। যেমন, বাহন হিসেবেব সেনাবাহিনীতে সাতশত উট একশত ঘোড়া ছিল, অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী, বর্ম ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম,বর্শা, তালোয়ার, তির-ধনুক, ইত্যাদি যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। আর মহানবী (সা.) এর সাথে মাত্র ৩১০ বা ৩১৩জন সাহাবা ছিলেন, যন্মধ্যে নয় বছর বয়সী বালক ছিল এবং মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল আর উটের সংখ্যা ছিল ৭০টি। মুসলমানরা এই বাহনগুলির উপর পালাক্রমে আরোহন করতেন। বর্মধারী সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয় বা সাতটি এবং বাকি যুদ্ধের সরঞ্জামগুলিও যথেষ্ট কম ও অসম্পূর্ণ।

শ্রোতাবৃন্দ! বদর যুদ্ধের বিবরণ বর্ণনা করা আমার বিষয় নয়। আসুন দেখি, এই প্রথম যুদ্ধ, যাকে পবিত্র কুরআন 'ইয়ওমুল ফুরকান' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, এক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কোন উত্তম নৈতিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

সর্বপ্রথম সেই দৃশ্যকে দৃষ্টিপটে নিয়ে আসুনন যেখানে তিনি (সা.) বদরের ময়দানে একটি ছাউনির নিচে আল্লাহ্‌র সামনে ক্রন্দন করছিলেন এবং এতটা কাতরভাবে যে, বারবার তাঁর কাঁধ থেকে চাদর খসে পড়ছিল আর হযরত আবু বকর (রা.) বার বার তা ঠিক করে দিচ্ছিলেন, এমনকি মহানবী (সা.) এর অঝোরে ক্রন্দন দেখে আবু বকর (রা.) অধিক চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আপনি ক্ষান্ত হোন। আল্লাহ্ কি তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন নি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই দিয়েছেন, তবে আমি তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণকে ভয় পাই, পাছে আমাদের প্রচেষ্ট ও পরিকল্পনায় কোন ঘাটতি না রয়ে যায় যাতে ঐশী সাহায্য অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসুলের ব্যকুল চিত্তের দোয়া যখন চরম সীমায় পৌঁছয় সেই সঙ্গে ঐশী সাহায্যকে আকর্ষিত করার জন্য এবং তাঁর আত্মমর্যাদাকে উদ্বেলিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যকুলভাবে খোদার নিকট দোয়া করেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْاَرْضِ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। হে আমার মালিক! যদি তুমি এই মুসলমান জামাতকে আজ এই ময়দানে ধ্বংস করে দাও, তাহলে পৃথিবীতে তোমার ইবাদতকারী আর কেউ থাকবে না।

অতঃপর ঐশী সাহায্যের প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে তিনি বাইরে বের হন এবং ঐশী সুসংবাদ ***"কাফের সেনাবাহিনী অচিরেই পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে।"*** আল কমর: ৪৬) শুনিয়ে এক মুঠো বালি-পাথর নিয়ে কাফের সেনাদের প্রতি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বললেন- "شَاهَتِ الْوُجُوْهُ শত্রুদের মুখ বিকৃত হবে।

শুধু এই মুষ্টিমেয় বালি এই মোজেযা দেখায় যে, এমন ঝড় উঠল যার ফলে কাফেরদের চোখ, হাত, নাক বালিতে ভরে যায়। মহানবী (সা.) -এর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে এবং কুরাইশদের নেতা আবু জেহেল, উতবা, শায়বা প্রমুখেরা নিহত হয়। অবশেষে মক্কার অবিশ্বাসীরা উন্মুক্ত বদর ময়দানে তাদের সত্তর জন নিহত ব্যক্তি ও সত্তর বন্দীকে ফেলে রেখে অবশিষ্ট প রাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে মক্কা ফিরে আসে।

এখানে মহানবী (সা.)-এর মহান নৈতিকতা সর্বসমক্ষে আসে। কাফের সেনাবাহিনীরা উন্মুক্ত ময়দানে তাদের নিহত ব্যক্তিদের ফেলে পলায়ন করে, কিন্তু মহানবী (সা.) সেখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মৃতদের নাকমুখ কেটে জন্তু জানোয়ারদের খাদ্য হিসেবে ফেলে যেতে রাজি হন নি, বরং একটি বড় গর্ত খনন করে ২৪ জন মুশরিক সর্দারদের সেখানে দাফন করে, যাকে বলা হয় 'কলিবে বদর'।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

শ্রোতাগণ! এট ছিল মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের জন্য প্রথম মহা বিজয়, যা কাফেরদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বা তাঁর সঙ্গীরা এই বিজয় উদযাপন না করে তাদের প্রভুর মহানুভবতার নারা উচ্চকিত করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আবু জাহেলকে হত্যা করে ও তাকে শেষ আঘাত হানার পর আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অবহিত করলাম যে, আবু জাহেল ধ্বংস হয়েছে। সেই সময় তিনি (সা.) তৌহিদের নারা সুউচ্চ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনিই কি সেই আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসুল। অতঃপর মহানবী (সা.) আবু জাহলের মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র হে আল্লাহর শত্রু! যিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ' এ ব্যক্তি এই উম্মতের ফেরাউন ছিল।" (মোজামুল কবীর, লিল তিবরানী, সূত্র: উসবায়ে ইনসানে কামিল, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৮১)

শ্রোতামণ্ডলী! মনে রাখতে হবে যে, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে যুদ্ধের আচার-আচরণ ও সার্বক্ষণিক নির্দেশ দিতে গিয়ে পূর্বেই বলেছিলেন-

* যুদ্ধের সময় বৃদ্ধ, শিশু এবং নারীদের হত্যা করবে না।

*ঘুমন্ত অবস্থায় রাতে শত্রুদের উপর আক্রমণ করবে না। রাতে রক্তপাত করবে না।

* ধর্মগুরুদের হত্যা করবে না। অন্য ধর্মের উপাসনাগারে ক্ষতি করবে না।

*সবুজ শস্য ক্ষেত, ফলদায়ক বৃক্ষ কর্তন করবে না। কোন জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে ভস্মীভূত করবে না।

*শত্রুদের শবদেহের অবমাননা করবে না এবং তাদেরকে পশুদের খাদ্য হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে যাবে না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে শত্রুর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশে আত্মরক্ষার্থে মহানবী (সা.) কে যখন তরবারি ধারণ করতে হয়, আর যুদ্ধ অবস্থায় যেখানে বিশ্ব সব কিছুকে বৈধ জ্ঞান করে, এমতাবস্থায় তিনি (সা.) সর্বপ্রথম বিশ্বকে যুদ্ধের রীতি নীতি শেখান। এই উচ্চ নৈতিকতা নিয়ে তিনি যখন যুদ্ধের জন্য বের হতেন, তখন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকত।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন কোন যুদ্ধের জন্য বের হতেন,তখন এই দোয়া পাঠ করতেন اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَاَنْتَ نَصِيْرِيْ وَبِكَ اُقَاتِلُ (মসনদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তুমি আমার ভরসা স্থল এবং তুমিই আমার সাহায্যকারী এবং আমি তোমার ভরসায় যুদ্ধ করি।

* এখন, উহুদ যুদ্ধের সংকটজনক পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর যে উত্তম আদর্শ প্রকাশ পেয়েছিল তন্মধ্য হতে মাত্র দুটির উল্লেখ করব। এক, নিজের প্রাণের আশঙ্কা উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খোদার আত্মমর্যাদার সঙ্গে সম্পর্ক

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

রাখতেন। মহানবী (সা.)-এর জরুরী আদেশ উপেক্ষা করে কয়েজন মুসলমান যখন প্রতিরক্ষামূলক স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে বিজয় সাময়িক পরাজয়ে পরিণত হয় এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফের বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং কয়েকজন সাহাবীসহ হযরত রসুল করীম (সা.) কে ঘিরে ফেলে। এ সময় তিনি আহত হন এবং একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যান। পতিত অবস্থায় নীচে ও উপরে সাহাবারা ছিলেন আর তিনি ছিলেন মাঝখানে। এরফলে তাঁর সম্পর্কে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, হয়তো তিনি (সা.) শহীদ হয়ে গিয়েছেন। যেমন, আবু সুফিয়ান ওই গুহার কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলল, হে মুসলমানগণ!তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ (সা.) জীবিত আছেন? তিনি (সা.) কাউকে কোন উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর সে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রসুল করীম (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী কেউ উত্তর দেন নি। এর ফলে আবু সুফিয়ান ভাবে, এরা সকলে মারা গেছেন,তখন উচ্চৈস্বর নারা দিয়ে সে বলে- 'উলু হুবাল' যার অর্থ হে হুবল তোমার জয়। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কেন উত্তর দিচ্ছ না? সাহাবায়ে কেরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল! আমরা কি উত্তর দিব? তিনি বলেন, ঘোষণা কর যে ***'ওয়াল্লাহু আলা ওয়া আজাল'*** অর্থাৎ আল্লাহ্ সুউচ্চ ও মহিমান্বিত। তখন আবু সুফিয়ান বলে ***'লানাল উজ্জা ওয়ালা উজ্জা লাকুম'*** আমাদের সাথে উযযা প্রতিমা আছে, আর তোমাদের সাথে কোন উযযা নেই। মহানবী (সা.) বলেন, বলে দাও اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ উযযা কি বস্তু? আমাদের সাথে আমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ্ আছেন আর তোমাদের সাথে কোন সাহায্যকারী নেই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইয়ার)

দ্বিতীয় ঘটনাটিও এই উপলক্ষ্যে যেখানে রহমাতুল্লিল মুমিনীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রাণের শত্রুদের জন্য ক্ষমা ও হেদায়াত প্রাপ্তির দোয়া করছেন।

যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, এই যুধে মুশরিকদে দ্বারা নবী করীম (সা.) আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। যার ফলে তাঁর দুটি দাঁত শহীদ হয়েছিল। এই প্রচণ্ড যন্ত্রণা ও কষ্টের সময় মহানবী (সা.) অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেছিলেন-

كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ
بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ

সেই জাতি কিভাবে মুক্তি পেতে পারে যে তার নবীর মুখমণ্ডলকে রক্তে রঞ্জিত করেছে কেবল এজন্য যে, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর করুণার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে বলেন- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা অজ্ঞতাবশতঃ এ অপরাধ করেছে।

(বুখারী, কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া)

বদর ও উহুদের যুদ্ধের পর মক্কার কাফের ও মুসলমানদের শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পায়। অতঃপর নির্বাসিত করার জন্য ইহুদীদের একটি গোত্র বনু নাযির অন্যান্য আরব গোত্রকে উস্কানি দিয়ে মক্কার কুরাইশদের হিংসার আগুনে জ্বালানি জোগাতে সাহায্য করে। অতএব, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এই বাহিনী মক্কা থেকে বের হলে, অন্যান্য গোত্র যেমন গাতফান, বনুস আসাদ, ফাযারাহ, আশজা , বনু মাররাহ প্রমুখেরা এই বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে এবং যখন তারা মদিনায় পোঁছায় তখন আরব গোত্রের ঐক্যবদ্ধ এই বাহিনীর সংখ্যা সংখ্যা দশ হাজারে পোঁছে যায় এবং মদিনায় একটি মহা স্রোতের ন্যায় মদিনায় এসে উপস্থিত হয় এবং অঙ্গীকার করে, যতক্ষণ না ভূপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের চিহ্ন মুছে ফেলবে, ততক্ষণ তারা ফিরে যাবে না। হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর গুপ্তচর বিভাগ এতটাই সমন্বিত ও সসংগঠিত ছিল যে, কুরাইশ সৈন্যদল মক্কা ত্যাগ করতেই নবী করীম (সা.)-এর কাছে সেই সংবাদ পোঁছে যায়। এর ফলে মহানবী (সা.) সাহাবীদের একত্র করে পরামর্শ দেন এবং হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর প্রস্তাব মেনে মদিনার অরক্ষিত অংশের সামনে একটি দীর্ঘ ও গভীর পরিখা খনন করে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে নেন।

অতএব, পরিখা খননের কাজ এমন অবস্থায় শুরু হয় যে, মুসলমানরা দীর্ঘ দিন অনাহারে ছিল এবং অন্যান্য সাহাবীদের পাশাপাশি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। এই সংকটময় সময়ে মহানবী (সা.) এর নিকট হতে যে উচ্চ নৈতিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তার কয়েকটি উল্লেখ করব।

একটি হল, সাহাবাগণ শ্রমিকের ন্যায় পরিখা খননে নিয়োজিত ছিলেন, এই কাজে আমাদের প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাহাবাগণকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নেন নি, বরং সাহাবাদের সঙ্গে খনন ও মাটি ফেলার কাজ করছিলেন। সংস্কারের কাজ করছিলেন। সাহাবাদের উৎফুল্লিত রাখতে কবিতাও পাঠ করছিলেন। এই কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَهْ
فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন, তাই তুমি নিজ অনুগ্রহে আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা কর। অনুরূপ কতক কবিতা এবং সাহাবাগণের সাথে সুর মিলিয়ে কবিতা আবৃত্তি করার উল্লেখ রয়েছে।

আরেকটি নৈতিক গুণ, যা কর্মকর্তা ও সেনাকর্তাদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক, তার বিশদ বিবরণ কিছুটা এরূপ যে, পরিখা খননের সময় একটি পাথর দেখা দেয় যা সাহাবীদের আঘাত ও প্রচেষ্টার ফলেও ভাঙ্গা সম্ভব হয় নি। একমাত্র মহানবী (সা.) এর সত্তা ছিল সাহাগণের আশ্রয়স্থল। সুতরাং, তাঁরা মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে সকল পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। তিনি (সা.) তাঁদের কোন কোন কৌশল বা পরামর্শ দিয়ে তাদের বিদায় দেন নি, বরং তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘটনা স্থলে পোঁছে কোদাল নিয়ে পাথরে আঘাত হানেন এবং এভাবে একের পর দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় আঘাতে তা ভেঙে চুরমার করে দেন।

আল্লাহ্র দরবারে মহাসম্মানিত এই বান্দার নিকট হতে এই মহান নৈতিকতা এভাবে সম্পাদিত হয়েছিল যে, মহানবী (সা.) প্রত্যেক আঘাতে আল্লাহু আকবর নারা লাগাতেন। সাহাবাগণ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, প্রথম আঘাতে আল্লাহ তাঁকে কাশফে সিরিয়া রাজ্যের চাবি ও সিরিয়ার লাল রঙের রাজপ্রাসাদ দেখিয়েছেন এবং দ্বিতীয় আঘাতে পারস্য রাজ্যের চাবি এবং শহরের শুভ্র প্রসাদগুলো দেখানো হয়েছে। তৃতীয় আঘাতে যে অগ্নিশিখা বের হয়েছিল, সেখানে ইয়েমেনের চাবি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় আঘাতে যে অগ্নিশিখা বের হয়েছিল, সেখানে ইয়েমেনের চাবি দেওয়া হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহর কসম! সেই সময় আমাকে ইয়েমেনের রাজধানী সান'আর দরজা আমাকে দেখানো হচ্ছিল। তাই আল্লাহ্র কুদরত দৃশ্য দেশে আমি আল্লাহু আকবার নারা লাগিয়েছিলাম যে, পরম পরাক্রমশালী ও সকল প্রকার মহিমার অধিকারী আল্লাহ্ আমাদের দুর্বল অবস্থাতে ভবিষ্যতের বিজয় ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের দৃশ্য দেখিয়েছেন।

শ্রোতাবৃন্দ! এটা কোন গল্প বা কিংবিদন্তী নয়, বরং বিশ্ব এই ঘটনা সাক্ষী যে, এই প্রতিশ্রুতিগুলো তাদের নিজ সময়ে, অর্থাৎ নবীজীর জীবনের শেষ সময়ে এবং বেশিরভাগই তাঁর খলিফাগণের সময়ে পূর্ণ হয়ে উক্ত দিব্যদর্শনগুলিকে সত্যায়ন করেছিল যে, বাস্তবেই, ভবিষ্যতের বিজয়ের এই দৃশ্যগুলি সর্বশক্তিমান খোদা চরম দুর্বলতার সময়ে দেখিছিলেন।

২০ দিনের ধৈর্যশীল অবরোধের পর, এটি কোন রক্তক্ষয় যুদ্ধ ছাড়াই, শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর দোয়া এবং আল্লাহ্র অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে এই আহযাবের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছিল। সাহাবাগণ এই অবরোধে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং অবশেষে আল্লাহ্র রসুল (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি আল্লাহর নিকট দোয়অ করুন, তিনি যেন স্বীয় রহমতে এই বিপদ দূর করেন এবং আমাদেরকে এমন কিছু দোয়া শেখান যাতে আমরাও এই সময় খোদার নিকট যাচনা করতে পারি। সুতরাং, তিনি (সা.) তাঁদের স্বান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তোমরা খোদার নিকট এই দোয়া কর যেমন তিনি তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে দেন এবং তোমাদের হৃদয়ে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদের অস্থিরতা দূরীভূত করেন।

অতঃপর তিনি (সা.) নিজেই এই দোয়া করেন-

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ،اهْزِمِ الْأَحْزَابَ،اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَ اعَلَيْهِمْ وَ زَلْزِلْهُمْ

হে কুরআন অবতীর্ণকারী ও পৃথিবীতে নিজের আদেশ প্রবর্তনকারী খোদা! হে হিসাব গ্রহণে তৎপর খোদা! তুমি স্বীয় কৃপায় কাফেরদের এই যুদ্ধে পরাজিত কর এবং আমাদেরকে তাদের উপর আধিপত্য দান কর এবং তাদেরকে বেশ ভালভাবেই আন্দোলিত কর।

শ্রোতামন্ডলী! এই দোয়াগুলোর প্রভাব দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা এমন কিছু ভূ-পৃষ্ঠীয় ও আসমানী বিষয় প্রকাশ করেছিলেন যে, একদিকে

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯))

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহান আল্লাহ্র বাণী

তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

যুদ্ধেক্ষেত্রে দলগুলোর মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, অন্যদিকে রাতে এমন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয় যে, কাফেরদের তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যায়, তাঁবুর পর্দা ছিড়ে উড়ে যায়, হাঁড়ি চুলার উপর উল্টে পড়ে যায়, ধুলাবালির ঝড় তাদের চোখ, নাক ও কান আবৃত করে ফেলে এবং সর্বোপরি বড় গজব এই আপতিত হয় যে, আরবদের প্রাচীন রীতি অনুসারে অনুসারে রাতের বেলা, একটা ব্যবস্থাপনার সাথে আগুন জ্বালানো হত সেই জাতীয় আগুন নিভে যায়, পূর্ব থেকেই দীর্ঘ অবরোধের কারণে তারা অস্থির ছিল আর এই দৃশ্যগুলো উক্ত উদ্বিগ্ন হৃদয়গুলোকে এমন আন্দোলিত করেছিল যে, সেনাবাহিনীর সেনাপতি আবু সুফিয়ান কুরাইশদের প্রধানদের ডেকে বলেন, "আমাদের অসুবিধা এখন বেড়েই চলেছে। এখানে অবস্থান বজায় রাখা সঙ্গত নয়। এই বলে সে তার লোকদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজেই তার উটে আরোহণ করে এবং অস্থিরতা এমন পর্যায়ে পোঁছেছিল যে, উটের পায়ের দড়ি খোলার কথা তার মনে ছিল না। যাইহোক, চোখের নিমিষে ১০,০০০ সৈন্যের বাহিনী এভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই মদীনার দিগন্ত কাফেরদের সেনাবাহিনীর ধুলো থেকে পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। এই দৃশ্য দেখে মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের ঘোষণা করে বলেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ
وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ

'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং তিনিই সকল সেনাদলকে পিছুপা করেছেন।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

প্রিয় শ্রোতাগণ!অন্যান্য যুদ্ধের উল্লেখ বাদ দিয়ে আমি মক্কার সংক্ষিপ্ত বিজয়ের সময় যে অনন্য ও অতুলনীয় নৈতিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তার কয়েকটি উল্লেখ করব, তবে তার পূর্বে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও খায়বার বিজয়ের প্রতি দিকপাত করা যথোচিত বলে মনে হচ্ছে। কেননা, হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয় হয়েছিল।

মনে রাখবেন, হুদায়বিয়া সফর কোন যুদ্ধ বা সংঘাতের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নকে বায়তুল্লাহ্‌র প্রদক্ষিণ করা সম্পর্কিত দিব্যদর্শনকে ঐশী ইশারা মনে করে ৬ হিজরীর যুল-কাদাহ মাসে চৌদ্দ শত সাহাবীকে নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মক্কার কুরাইশদের পক্ষ থেকে বাঁধা দেওয়া হচ্ছিল। যখন মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ যুল-হুলাইফা থেকে এহরাম বেঁধেছিলেন এবং প্রদক্ষিণের পর কুরবানীর জন্য পশু সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর বলপূর্বক মক্কায় প্রবেশের কোন ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি তাঁর জামাতা হযরত উসমানকে মক্কাবাসীদের বোঝানোর জন্য দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন, কিন্তু হযরত উসমানের প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হয়। এই গুজব ছড়ানো হয় যে, হযরত উসমানকে (রা.) শহীদ করে দেওয়া হয়েছে।

এই সংবাদ শুনে রসুলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত সাহাবাগণের মাঝে ঘোষণা করে তাঁদেরকে একটি বাবলা গাছের নীচে জড়ো করে বলেন, "যদি এই খবর সত্য হয়, তাহলে খোদার কসম! উসমানের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে এক পা পিছাব না।" অতঃপর তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন, আস, আমরা হাতে উপর হাত রেখে অঙ্গীকার কর যে, তোমাদের মধ্যে কেউ পিঠ দেখাবে না, নিজের জীবন বাজি রাখবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই স্বীয় স্থান ত্যাগ করবে না।

এরপর মহানবী (সা.) মক্কার কাফেরদেরকে অত্যন্ত স্পস্ট ভাষায় বার্তা দেন যে, "আমাদের লক্ষ্য যুদ্ধ বিগ্রহ নয়। আমরা শুধু বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করার উদ্দেশ্যে এসেছি, এই উদ্দেশ্যে যে কেউ বাধা দেয়, বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলেও আমরা তা করব। তবে শর্ত হল, কুরাইশরা যদি আমাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শান্তি চুক্তি করতে চায় তো করতে পারে।"

অতএব, মহানবী (সা.) মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধিত্বকারী সোহেল বিন আমরের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন, যা 'সুলাহ হুদায়বিয়া' নামে খ্যাত। এই চুক্তির কিছু শর্ত এমন ছিল যা সাহাবাগণ মেনে নিতে পারছিলেন না এবং হযরত উমর (রা.) খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) নিশ্চল পাহাড়ের ন্যায় এটাই চাইছিলেন যাতে বায়তুল্লাহ্‌র শান্তি বিনষ্ট না হয়। সুতরাং তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, মক্কার কুরাইশরা আমার কাছে যে কোন দাবি করবে, যদ্দারা আল্লাহর সম্মানিত জিনিসের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমি অবশ্যই তা গ্রহণ করব।

যাইহোক, এই চুক্তিটি লেখা হয় এবং মহান আল্লাহ্ এটিকে এমন কবুল করেছিলেন এবং হযরত রসুল করীম (সা.) এর এই সন্ধির পদক্ষেপ যা বাহ্যিকভাবে পছন্দ করা হয় নি, এই সন্ধিচুক্তির পর প্রত্যাবর্তনের সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উপর এক মহান সূরা অবতীর্ণ করেন যা সূরা ফাতাহ নামে পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ আছে। বিসমিল্লাহর পর প্রথম আয়াতে এই সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায় দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (আল ফাতাহ: ০২) নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় প্রদান করেছি। সন্ধির সময় মহানবী (সা.) এর হাতে প্রাণ উৎসর্গ করার যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ
يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ (الفتح:11)

(আল ফাতাহ: ১১) নিশ্চয় যারা তোমার বয়আত করে বস্তুতঃপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র বয়আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাদের হাতের উপর আছে। অতএব, কতই না মহান এই রসুল যার হাতকে আল্লাহ্ নিজের হাত আখ্যায়িত করেছেন। আর কতই না সৌভাগ্যবান সেই সকল সাহাবা যারা এক কথায় আল্লাহ্‌র হতে বয়আত করেছিলেন।

অতএব, এই সূরার ১৯ নম্বর আয়াতে এই বয়আতকারীদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির সনদ প্রদান করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন –

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ
السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মোমেনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তারা একটি বৃক্ষতলে তোমার বয়আত করেছিল এবং তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা অবগত ছিলেন। সুতরাং, তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযেল করলেন এবং তাদেরকে এক নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন।

অতএব, এই সূরার প্রারম্ভে সুস্পষ্ট বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যা ভবিষ্যতে মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ফল দান করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তৎক্ষণাৎ স্বান্ত্বনার জন্য এক নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদ শোনানো হয়েছিল যা কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতীত খয়বার বিজয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল।

এখন আমি খয়বার বিজয়ের ঘটনা বাদ দিয়ে এই বিজয়ের পর প্রকাশিত কেবল একটি নৈতিকতার উল্লেখ করে মক্কা বিজয়ের সময় প্রকাশিত উত্তম আদর্শের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করব।

হযরত আরবায বিন সারিয়া বর্ণনা করেন, আমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে খয়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। খয়বারের নেতা একজন কঠোর বেপরোয়া ব্যক্তি ছিল। বিজয়ের পর সে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসে বলে, হে মুহাম্মদ (সা), তোমাদের কি অধিকার আছে আমাদের পশু জবাই করার, আমাদের ফল খাওয়ার এবং আমাদের নারীদের প্রহার করার? এ কথা শুনে মহানবী (সা.) মহানবী (সা.) খুবই ক্ষুব্ধ হলেন এবং আব্দুর রহমান বিন অউফের মাধ্যমে ঘোষণা করিয়ে লোকদেরকে নামাযের জন্য সমবেত করলেন এবং সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যারা বালিশে হেলান দিয়ে বসে এই খেয়াল করছে যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিষয় ব্যতীত আল্লাহ্ অন্য কিছু হারাম করেন নি? শোন আমি কিছু বিধি-নিষেধ বর্ণনা করেছিল সেগুলিও কুরআনের ন্যায়।

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বৈধ করেন নি যে, তোমরা আহলে কিতাবদের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে এবং তাদের নারীদের প্রহার করার অনুমতি দেন নি এবং তাদের ফল খাওয়ারও নয়। যদিও (চুক্তি অনুযায়ী) তারা তোমাদের কিছু দিচ্ছে যা তাদের দায়িত্বে রয়েছে (অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করছে) (আবু দাউদ)

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফল-ফলাদির মধ্যে একটি হল খয়বার বিজয়, নিকটবর্তী বিজয়ের সুসংবাদে পূর্ণ হয়েছিল। এর দুই বছর পর ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দৃশ্য দেখতে পায় বিশ্ব। এই বিজয় আসলে মক্কার কুরাইশদের হুদায়বিয়া চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণার একটি ফল।

রসুলুল্লাহ্ (সা.) দশ হাজার ওলীর দল নিয়ে মদিনা থেকে মক্কায় যাত্রা করেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, এত বড় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি ও গতিবিধি গোপন রাখা দৃশ্য অসম্ভব ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) প্রত্যেক কঠিন পর্যায়ে দোয়া ও পরিকল্পনা করতেন। তিনি (সা.) দোয়া করেন-

اَللّٰهُمَّ خُذِ الْعُيُوْنَ وَالْاَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ

হে আল্লাহ্ কুরাইশদের গুপ্তচরদের দূরে রাখা এবং আমাদের খবর তাদের নিকট পোঁছিও না এবং তিনি (সা.) এই পরিকল্পনা নেন যে, মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় পাহারাদার নিযুক্ত করেন।

অতএব, আল্লাহ্ মহানবী (সা.)এর দোয়া ও ব্যবস্থাপনা এমনভাবে কবুল করলেন যে, অলৌকিকভাবে এই বিশাল বাহিনী কোন প্রকার নোটিশ বা প্রতিরোধ ছাড়াই মক্কার উপত্যকায় প্রবেশ করল। তিনি (সা.) সাহাবাগণকে বিভিন্ন টিলার উপর ছড়িয়ে পড়ার এবং প্রত্যেককে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দেন। এভাবে সেই রাতে দশ হাজার মশাল প্রজ্জলিত হয়ে তাদের টিলার উপর এক দুর্দান্ত এবং আশ্চর্যজনক দৃশ্য ফুটে ওঠে। (বুখারী)

অপরদিকে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা রাতে মক্কায় টহল দিতে বের হয়ে অগণিত আলো দেখে অবাক ও আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায়। কেননা, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আবু সুফিয়ানের জন্য শান্তি ও স্বস্তির ঘোষণা করেছিলেন এবং হযরত আব্বাস

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

(রা.) তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সকালে আবু সুফিয়ানকে নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে পেশ করা হলে তিনি (সা.) বলেন, আবু সুফিয়ান! তোমার কি সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসে নি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই? অতঃপর সেই আবু সুফিয়ান, যে উহুদ যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর শাহাদতের ঘোষণায় খুশি হয়ে হুবল মূর্তির নারা দিয়েছিল এবং উযযা প্রতিমাকে নিজের প্রভু বলে ঘোষণা করেছিল,তখন মহানবী (সা.) -এর সামনে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন, আমার পিতা-মাতা আমার জন্য কুরবান। আপনি খুব জ্ঞানী, দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল। যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করতেন।

(ইবনে হিশাম)

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত সুলায়মান (আ.) যখন সাবা সম্রাজ্ঞীকে প্রকত্ববাদ ও আনুগত্যের বার্তা দেন, তখন সম্রাজ্ঞী সভাসদদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইলেন, সম্রাজ্ঞী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এবং রাজ ও বিজয়ীদের আচরণ সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন ছিলেন, তিনি বলেন-

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا
وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

(সূলা নমল: ৩৫)

স্মরণ রেখো, যখন বিজয়ীরা নিজের এলাকায় প্রবেশ করে, তখন সেখানে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং সেখানকার সম্মানীয় বাসিন্দাদেরকে লাঞ্ছিত করে এবং তারা এমনই করে থাকে।

কিন্তু, দেখে নেওয়া যাক মক্কা বিজয়ের দিনে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর কোন্ আদর্শ প্রকাশ পেয়েছিল, মক্কার মুশরিকদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছিল, যারা তেরো বছর ধরে মক্কায় তাঁকে, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাথীদের উপর এমন অত্যাচার চালিয়েছিল, যা পড়লে ও শুনলে আমরা শিউরে উঠি। মদীনায় হিজরত করার পরও তারা তাঁকে ও তাঁর সাথীদের সুখে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। বদর ও উহুদের যুদ্ধে তরবারি দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করতে ও ইসলামের নাম নিশ্চিহ্ন করতে সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছিল, আবার আশেপাশের গোত্রগুলিকে একত্রিত করে দশ-বারো হাজারের বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণ করেছিল এবং দুর্বল মুসলমানরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় পরিখা খনন করে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। অতঃপর মুসলমানরা যখন কাবা তাওয়াফ করতে আসে, তখন তারা হুদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁদে আটকে দিয়ে নিজেদের পছন্দের শর্তে সন্ধি করে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। এই সকল নৃশংসতার কাহিনীকে সামনে রেখে রহমাতুল্লিল আলামীনের উত্তম আদর্শকে পর্যবেক্ষণ করা যাক।

শান্তি ও নিরাপত্তার সম্রাট হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পক্ষ থেকে যখন মক্কার এই নিষ্ঠুর কাফেরদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তোমরা এখন আমাদের নিকট হতে কেমন ব্যবহার পাওয়ার প্রত্যাশা কর? তারা উত্তরে বলেছিল, আপনি যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু আপনার ন্যায় দয়ার্দ্র মানুষের নিকট আমরা সদাচরণের আশা রাখি। হযরত ইউসুফ তার ভাইদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন।"

শ্রোতামণ্ডলী! মহানবী (সা.)-এর এর বিজয় কেবল মক্কা নগরী ও মক্কাবাসীদের উপর ছিল না, বরং তাঁর মহান আদর্শের জয় ছিল, শত্রুরাও তা অস্বীকার করে না। মহানবী (সা.) তাদের প্রত্যাশারও অনেক বেশি কৃপাসুলভ ব্যবহার করেছিলেন। তাদের সমস্ত নৃশংসতাকে উপেক্ষা বলেছিলেন-

اِذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا
تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ

যাও তোমরা সকলে মুক্ত। আজ তোমাদের উপর অত্যাচার করা হবে না। কেবল আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করছি না, বরং আমার প্রভুর নিকটও তোমাদের জন্য ক্ষমা যাচনা করছি। (ইবনে হিশাম)

শান্তির নিশ্চয়তা সম্বলিত এই সর্বজনীন ঘোষণাও করান যে, 'আজকে মসজিদে হারামে প্রবেশকারী প্রত্যেককে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে বা নিজের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে এবং নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি বিলাল হাবশীর পতাকাতলে আশ্রয় নিবে তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (হালবিয়া)

প্রিয় শ্রোতাগণ! যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শের বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি যুদ্ধকালীন জরুরী পরিস্থিতিতে তাঁর ইবাদতের অবস্থা বর্ণনা করা না হয়।

সংক্ষেপে তা এমনই যে, যুদ্ধের সময় ভয় ও বিপদের পরিবেশেও মহানবী (সা.) বাজামাত নামায পরিত্যাগ করেন নি। এমতাবস্থায়ও সাহাবাদের এভাবে নামায পড়িয়েছিলেন যে, একদল শত্রুদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধে রত আর অন্য দল তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে অর্ধেক নামায আদায় করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় আর যুদ্ধরত সাহাবারা এসে অবশিষ্ট নামায আদায় করেন আর এভাবে উভয়ে মিলে নামায সম্পূর্ণ করতেন। এভাবে তিনি (সা.) তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে উম্মতকে বুঝিয়েছেন যে, মৃত্যুর সবচেয়ে বড় বিপদের অবস্থায়ও ফরজ নামায মাফ হয় না।

রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আহযাবের যুদ্ধে শত্রুদরে প্রচণ্ড লড়াই এবং তাদের ক্রমাগত আক্রমণের কারণে

(এরপর ১৮ পাতায়.....)

বর্তমানে যুদ্ধে যে-সকল সমরাস্ত্র ব্যবহৃত হয় তার ফলে সাধারণ নাগরিকরাও নিহত হয়, আর যুদ্ধের পরিস্থিতি নতুন মোড় নেওয়ায় সাধারণ নাগরিক নিহত হচ্ছে। অতএব, (আমাদের) দোয়া করা উচিত যেন উভয় পক্ষ সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং বড়ো ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

এই প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা আবশ্যক, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা ইন্টারনেটের অন্যান্য যে-সকল মাধ্যম রয়েছে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যা-ই রয়েছে, ক্ষুদেবার্তা ইত্যাদিতে প্রত্যেকে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করে এবং নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী যা ইচ্ছা বলে বেড়ায়, যার ফলে লাভের তুলনায় ক্ষতিই বেশি হয়। খুবগর্বের সাথে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বসে।

আহমদীদের এমন কাজ এড়িয়ে চলা উচিত। কেননা এরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশে উপকারিতার তুলনায় ক্ষতি বেশি। যদি বার্তা প্রদানের অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা প্রদান করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর জীবনের সর্বশেষ বার্তায়, অর্থাৎ তিনি যে 'পয়গামে সুলেহ্' পুস্তক লিখেছিলেন, তাতে তিনি এই শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তাই দিয়েছিলেন। তাই প্রত্যেক আহমদীর তা স্মরণ রাখা আবশ্যক এবং এর জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সকল নিরীহ মানুষের প্রাণহানি থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। কতক পরাশক্তি একে(তথা এই যুদ্ধকে) উসকে দেবার চেষ্টা করছে। তারা চায়, উভয় দেশ লড়ুক আর দুর্বল হয়ে যাক আর তাদের অস্ত্র বিক্রি হোক। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন আর তারা যেন শান্তিতে নিজ দেশে বসবাস করতে পারে। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শান্তির কোনো সুযোগ নেই, বরং তাদেরকে এখান থেকে কোনোভাবে বের করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে আর এ কাজে সকল পরাশক্তি ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহকে বিবেকবুদ্ধি দান করুন যেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় তবে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কতক দেশের এরূপ ধারণা করা ভুল, বিশ্বযুদ্ধ হলেও তারা নিরাপদ থাকবে। এটি সবাইকেই নিজের গ্রাসে পরিণত করবে।

সুতরাং এমন ভু ল ধারণা সবার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে রক্ষা করুন। যাহোক, আমি যেভাবে সবসময় বলে থাকি, এর একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অবনত হওয়া, আর এটিই একমাত্র উপায় যা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে। এটি ছাড়া (মুক্তির) আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

(সৌজন্যে: আলফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৩০ শে মে, ২০২৫)

আহমদী ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (দারুল সানাত)-এ ভর্তি চলছে

(শিক্ষাবর্ষ: ২০২৫-২৬)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ও বিশেষ নির্দেশনায় ২০১০ সালে কাদিয়ানে 'দারুল সানাআত' (কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হল আহমদী ছাত্রদেরকে প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে সুদক্ষ করে তাদের জন্য উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া। কাদিয়ানের 'দারুল সানাআত' সরকারি প্রতিষ্ঠান NSIC এবং ISO নথিভুক্ত। এখানে একবছরের বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। যেমন-

(1) Computer applications (2) Plumbing (3) Electrician (4) Welding (5) Motor Vehicle (6) Diesel Mechanic (7) AC & Refrigerator

কাদিয়ানের বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও মেসের ব্যবস্থা আছে। থাকা ও খাওয়ার কোন ফি নেওয়া হয় না। কোর্সের জন্য বোর্ড ফি সহজ কিস্তিতে নেওয়া হয় । যে সমস্ত আহমদী ছাত্র স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে নি কিম্বা অষ্টম ও দশম শ্রেণীর পর টেকনিক্যাল কোর্স করতে ইচ্ছুক, তারা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। আহমদী ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যহ Personality Development এবং English Speaking-এর ক্লাসও নেওয়া হয়। নতুন শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৬ই জুলাই থেকে ক্লাস আরম্ভ হবে।

বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত ইমেল ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

darulsanaat.qadian@gmail.com

Mob:9872725895, 8604024043

(Principal, Darul Sanaat)

ইসলামী শিষ্টাচার (আদবকায়দা) ও চরিত্র’

মুজীব লোন, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্, ভারত

অনুবাদক: মির্জা ইনামুল কবীর, মুয়াল্লিম সিলসিলা

যুগ ইমাম হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

”الطريقة كلها ادب“

অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার যাবতীয় ভিত্তি শিষ্টাচারের উপর নির্ভরশীল। আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য আমাদের অবশ্যকরণীয় হল যে আমরা ইসলামের পেশকৃত শিষ্টাচারকে যেন সর্বদা স্মরণ রাখি। এটাই সেই চাবিকাঠি যার মাধ্যমে আমরা পূর্ণ চরিত্রবান হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারি। অতঃপর আমরা ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমানের দিকে গতিশীল থাকতে পারব।

হুযুর বলেন: “কুরআন করীম সেই সমস্ত শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় যার জ্ঞান লাভ করা মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য একান্ত জরুরী। এবং প্রত্যেক ধরণের ফাসাদকে (অশান্তিকে) এতটা শক্তির সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া জানায় যতটা শক্তির সঙ্গে বর্তমানে তা প্রসারিত হয়ে চলেছে। তার শিক্ষা চরম সরল সোজা ও দৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য। যেন প্রাকৃতিক নির্দেশনাবলীর একটা আয়না স্বরূপ এবং মানবপ্রকৃতির এক প্রতিচ্ছবি।”

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ পুস্তক ‘ইসলামী নীতি-দর্শন’-এ সংশোধনের জন্য যে তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে থেকে প্রথম পদ্ধতি যা তিনি বর্ণনা করেছেন তা হল- “অসভ্য পশুকে প্রথমে এই নিম্নমানের চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করা উচিত যে তারা খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহ ইত্যাদি সংস্কৃতির বিষয়ে মানবতার পথ অবলম্বন করে। না উলঙ্গ ঘোরাফেরা করবে আর না কুকুরের ন্যায় মৃত ভক্ষণকারী হবে এবং না অন্য কোন প্রকারের অসভ্যতা প্রকাশ করবে। এগুলো স্বাভাবিক অবস্থার সংশোধনের মধ্য হতে নিম্নমানের সংশোধন। এগুলো এই প্রকারের সংশোধনের মধ্য হতে নিম্ন মানের সংশোধন। এগুলো এই প্রকারের সংশোধন যেমন পোর্ট ব্লেয়ারের বন্য মানুষগুলির মধ্য হতে যদি কাউকে মানবতার পাঠ শেখানো হয় তাহলে প্রথমে চরিত্র গঠনের ছোট ছোট পাঠ ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া হবে।”

(ইসলামীন নীতি দর্শন)

আল্লাহর প্রিয় খলিফা ও নবী সৈয়্যদানা হযরত আকদস মুহাম্মদ আহমদ মুজতবা খাতামান্নবীঈন (সা.) আরবের মুরভূমিতে যে মহান বিপ্লব সাধন করেছিলেন তার বুনিয়াদ তিনি (সা.) মানবীয় আদব কায়দা ও শিষ্টাচার শেখানোর মাধ্যমে রেখেছিলেন। এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“প্রকৃতপক্ষে এই পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিল যে তিনি হিংস্র চরিত্র ও চতুষ্পদ প্রকৃতির ন্যায় এক জাতিকে মানবতার শিষ্টাচার শিখিয়েছেন অথবা ভিন্ন কথায় বলা যেতে পারে যে চতুষ্পদকে মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। অতঃপর মানুষকে শিক্ষিত মানুষ বানিয়েছেন। এবং শিক্ষিত মানুষকে খোদাভীরু মানুষের রূপ দিয়েছেন। এবং তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ফুৎকার করেছেণ। এবং সত্য খোদার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছে।”

(লেকচার সিয়ালকোট,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৬-২০৭)

রসুলে করীম (সা.) যে যুগে পৃথিবীতে প্রেরিত হন সেই যুগে মানুষের কী রূপ অবস্থা ছিল তার প্রকাশ আল্লাহ্ তা’লা এভাবে করেছেন - ظهر الفساد فی البر و البحر

অর্থ: কী মানবীয় শিষ্টাচারের দৃষ্টিকোণ থেকে কি চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কী-ই বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ প্রতিটি দিক থেকে মানুষের চরিত্র নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর ছিল। কেবল অশান্তিই বিরাজমান ছিল। মানুষের চরিত্র মৃতের ন্যায় ছিল। (সূরা রোম: ৪২) এমন অবস্থায় রসুলে করীম (সা.)এর আগমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা’লা বলেন-

اِعلموا انّ اللہ یُحی الارضَ بعد موتہا۔

অর্থ একথা জেনে নাও যে আল্লাহ্ তা’লা এখন পৃথিবীর মৃত্যুর পর নবরূপে জীবিত করতে লেগেছেন। (আল হাদীদ: ১৮)

মোটকথা রসুলে করীম (সা.) এমন একটা সময়ে আগমণ করেছিলেন যখন আরবের মানুষ মানবীয় শিষ্টাচার শূন্য হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই আল্লাহ্ তা’লা তাদের সম্পর্কে বলেছেন اولئك كالانعام بل هم اضل

অর্থাৎ তারা হিংস্র জন্তুর ন্যায় বরং তার চেয়েও অধম পথভ্রষ্টতায় ডুবে ছিল। (সূরা আরাফ: ১৮০)

এ স্থান থেকে তাদের উঠিয়ে মহানবী (সা.) সেই স্থানে পোঁছে দিয়েছেন, যাতে তিনি (সা.) তাদেরকে কেবল মানবীয় শিষ্টাচারই শেখান নি বরং তারা চরিত্রেও অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন। এবং আধ্যাত্মিকতারও অতি উচ্চ মর্যাদায় পদার্পণ করেছেনন। এমনকি আল্লাহ্ তা’লা তাদেরকে মহা সনদ প্রদান করেছেন। رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

হযরত রসুলে আকরম (সা.) তাদের ওঠা-বসা, চলাফেরা আদব শিখিয়েছেন, খাওয়া-দাওয়া ও দাওয়াতের আদব,সাক্ষাতের আদব, বড় ও বুজুর্গদের সম্মান প্রদর্শন, কথাবলার আদব, শোওয়া ও জাগার আদব, কাপড় পড়ার আদব, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার আদব, ব্যবসা বাণিজ্য প্রত্যাহিক জীবনের কাজকর্মের আদব, ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি, ভ্রমণের আদব, মেলামেশা করা ও সাক্ষাতের আদব, অন্য কারো গৃহে যাওয়ার আদব, ঘর থেকে বের হওয়ার এবং ফিরে আসার আদব, অসুস্থের দেখাশোনার পদ্ধতি, শোকজ্ঞাপনের আদব, কাফন ও দাফন করার আদব, মজলিসের আদব, মোট কথা প্রত্যেক ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন। এমন কি পায়খানা যাওয়ার আদবও শিখিয়েছেন। অতঃপর তিনি এসব কিছু এমনভাবে শিখিয়েছেন যে পৃথিবীর জন্য সেগুলো অনুকরণযোগ্য হয়ে গেছে। আর রসুলে করীম (সা.) তাদেরকে এমন সনদ দান করেছেন যে, اصحابی کالنجوم فبایہم اقتدیتم اہتدیتم অর্থাৎ আমার সাহাবাগণ নক্ষত্ররাজির ন্যায়। তাদের মধ্য থেকে তোমরা যার অনুসরণই কর না কেন হেদায়েত প্রাপ্ত হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কতই না সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন-

صادفتہم قوما کروث ذلۃً
فجعلتہم کسبیقۃ العقیان

অর্থাৎ তুমি তাদেরকে গোবরের ন্যায় নিকৃষ্ট পেয়েছিলে। অতঃপর তুমি তাদেরকে সোনার টুকরোর ন্যায় বানিয়ে দিলে।

আসুন আমরা এখন সেই শিষ্টাচারের বিষয়গুলিতে দৃষ্টি দিই যা ইসলাম ও তার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন।

খাওয়া দাওয়ার আদব

সর্বপ্রথম খাওয়া দাওয়ার আদব সম্পর্কে কথা বলব। খাদ্যগ্রহণ মানুষের জীবনের একটা আবশ্যিক কাজ। খাদ্য যেখানে মানুষের শরীরের বৃদ্ধির মূল ভূমিকা পালন করে, সেখানে মানুষের চরিত্রের উপরও একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এই যথার্থতার দৃষ্টিকোণ থেকে খাওয়া দাওয়া ইসলামী আদবের মধ্যে কেবল এ কথায় যুক্ত নয় যে আমাদের কীভাবে খাদ্যগ্রহণ করা উচিত বরং এটাও যুক্ত যে আমাদের কী কী খাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা’লা বলেন-

كُلوا من طيبٰتِ مَا رَزَقنٰكُم

অর্থ: সেই রিজক হতে তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর যা আমরা তোমাদের দিয়াছি তার থেকে পবিত্র বস্তু। অর্থাৎ হে লোকেরা! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও। (সূরা বাকারা: ১৭৩) হালাল ও হারামের বিবরণ বর্ণনা করার পরও আল্লাহ্ তা’লা উক্ত নির্দেশনার মধ্যে পবিত্র বস্তুগুলোর খাওয়ার দৃঢ় আদেশ দিয়েছেন। আর পবিত্র বস্তুগুলো মধ্যে প্রত্যেক সেই হালাল বস্তু অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের শরীরকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করার সঙ্গে সঙ্গে তার চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারন হয়। অতএব, এটা সেই মূল নীতি যা আমাদেরকে একথার দিকে পথ প্রদর্শন করে যে আমাদের কী খাওয়া উচিত।

আবার খাদ্য গ্রহণ করার পূর্বে হাত ধোয়া, পরিষ্কার পাত্রে খাদ্য খাওয়া, আল্লাহ্র নামের সঙ্গে বিসমিল্লাহ্ আল বারাকাতুল্লাহ পড়ে খাদ্য খাওয়া আরম্ভ করা এবং খাওয়া শেষ করার পর আলহামদোলিল্লাহিলাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়াজালানা মিনাল মুসলিমিন’ পাঠ করা এবং খাদ্য খাওয়ার পর কুলকুচি করা এবং হাত ও বাসন পরিস্কা করা এমন শিষ্টাচার যা আমাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকে জানেন ও আমল করেন। স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য উক্ত নীতি সমূহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

যে কোন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় বস্তু ডান হাত দিয়ে ব্যবহার করাও সুন্নতে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

মধ্যে পড়ে। আর এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর জোরপূর্বক নির্দেশও মজুদ আছে। কিছু কিছু মানুষ বলে থাকে দুটো হাতই আল্লাহ্ দান করেছেন। মানুষ যে হাত দিয়ে ইচ্ছা খেতে পারে। এতে অসুবিধা কিসের? এমন মানুষদের চিন্তা করা উচিত যে, যে হাতটি শৌচকর্মে ব্যবহৃত হয়, সেই হাত দিয়েই খাদ্য খাওয়া মানুষের প্রকৃতি কি গ্রহণ করে? হ্যাঁ খাওয়া বা পান করার ব্যাপারে ডান হাতের সাহায্য গ্রহণ করার মধ্যে কোন অশালীনতা বা দোষ নেই।

আল্লাহ্ তা'লার দেওয়া রিজিকের সম্মান করা, তার আদব ও মর্যাদা রক্ষা করাও আমাদের জন্য জরুরী। কিছু কিছু মানুষ শুয়ে অথবা বালিশে ঠেস দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) বালিশে ঠেস দিয়ে খাদ্য খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা এক ধরণের অহংকারপূর্ণ চালচলন। এবং এই পদ্ধতিটি আল্লাহ্ ত'লা প্রদত্ত রিজিকের অসম্মান করার নামান্তর।

কিছু কিছু মানুষের অভ্যাস হল যখন খায় অতিরিক্ত পেট ভরে খায় এমনকি ঢেকুর ওঠা শুরু হয়ে যায়। এ ব্যাপারে স্মরণে রাখা উচিত যে মোমেন গুণ হল যে স্বল্পভক্ষণকারী হয়ে থাকে। হুযুর (সা.) এর খাদ্য ও খুব স্বল্প ও সরল ছিল। তিনি (সা.) বলতেন, দুইজন ব্যক্তির খাবার তিনজনের ও তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে।" (মুসলিম)

কোন কোন এলাকার মানুষ বিয়ে শাদির অনুষ্ঠানে দাওয়াত বা ওলিমা ইত্যাদিতে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে থাকে। এমনকি কখনও কখনও দরিদ্র মানুষও বাড়াবাড়ি করে খরচ করে আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে যায়। ইসলাম আমাদেরকে কোন মতেই এই পদ্ধতি শেখায় না। বরং শুধুমাত্র প্রয়োজনানুসারে খাওয়া দাওয়ার শিক্ষা দান করে বাড়াবাড়ি করা থেকে পরিপূর্ণভাবে নিষেধ করেছে। এ বিসয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল শিক্ষা হল এই যে كلوا واشربوا ولا تسرفوا অর্থ: খাও ও পান কর এবং বাড়াবাড়ি করো না। (সূরাতুল আরাফ: ৩২) পানি অথবা ভিন্ন কোন পানীয়ের ব্যবহারের ব্যাপারে এ কথার প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত যে পানপাত্র ডান হাত দিয়ে ধরা উচিত। বিনা ব্যতিক্রমে পানি দাঁড়িয়ে পান করা উচিত নয়। একদা মহানবী (সা.) বলেন, উটের ন্যায় এক শ্বাসে পান করো না বরং দু-তিনটি শ্বাসের সঙ্গে পান কর। একইরকমভাবে তিনি (সা.) পানি পান করার সময় বাসনের মধ্যে শ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন।"

এখানে একথারও উল্লেখ করি যে, পানি ব্যবহারের আদবের মধ্যে এই জরুরী বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত যে পানি অপচয় করা উচিত নয়। বর্তমানে পানির বিভিন্ন সমস্যাবলী সৃষ্টি হচ্ছে। পানির স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে যার ফলে পৃথিবী কষ্টে নিপতিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আজ থেকে দেড় হাজার পূর্বে আমাদেরকে পানি অপচয় করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। একবার তিনি (সা.) একজন সাহাবীকে ওজু করার সময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পানি খরচ করতে দেখে উপদেশ দিলেন, "পানি অপচয় করো না, যদিও তুমি প্রবাহিত নদীর কিনারায় বসে থাক না কেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) এটি একটি চিন্তাভাবনার স্থল যে নদীতে যেখানে পরিমিত পানি থেকে থাকে সেখানে পানি নষ্ট না করার উপদেশ দিচ্ছেন। সুতরাং আমাদের নিজেদের ঘরে অথবা অন্যান্য স্থানে পানি ব্যবহার করার সময় কতটা বেঁচে চলা উচিত।

আবার দাওয়াত করার আদবের মধ্যে একটি আবশ্যিক বিষয় হল যে ধনী লোকেরা যখন আমন্ত্রণ করে তারা যেন ধনীদের পাশাপাশি গরীবদেরও আমন্ত্রন জানায়। মহানবী (সা.) বলতেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমন্ত্রন হল সেটি যার মধ্যে কেবল ধনীদের আমন্ত্রন জানানো হয় এবং গরীবদেরকে বাদ দেওয়া হয়। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ)। অনুরূপভাবে যদি কোন গরীব ধনীদের আমন্ত্রন জানায় তাহলে তাদের উচিত তারা যেন অবশ্যই সেই আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়। মহানবী (সা.) বলেন لو دُعيتُ الى كراعٍ لَأُجبتُ অর্থাৎ যদি কোন গরীব ব্যক্তি আমাকে ছাগলের পায়ার জন্যও আমন্ত্রিত করে তবুও আমি অবশ্যই তার দাওয়াত কবুল করব।

দাওয়াত খাওয়ার সময় প্রয়োজন মতই খাদ্য নেওয়া উচিত যেন খাদ্য নষ্ট না হয়। জলসা সালানার সময়ও আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গার থেকে প্রস্তুতকৃত খাদ্য হতে লাভবান হই। সে সময়ও আমাদের খাওয়ার সময় ঐ সমূহ শিষ্টাচারকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। খাবারের প্রতি অতি আগ্রহ দেখানোর পরিবর্তে ক্ষুধা মেটানো পর্যন্ত খাবার খাওয়া উচিত। খাদ্য নষ্ট করা হতে বিরত থাকা উচিত। খাবার পাত্র, খাওয়ার স্থান ও আশপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। খাবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই ইসলামী শিষ্টাচারগুলিকে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা:

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও ইসলামী শিষ্টাচার বিদ্যমান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তাকে কে অস্বীকার করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের মধ্যে বলেন-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(সূরা বাকারা: ২২৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারীদেরকেও ভালবাসেন।

জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "এই আয়াতের মধ্যে কেবল এই বিষয়ের কথা বলা হয় নি যে আল্লাহ্ তা'লা তওবাকারীদের পছন্দ করেন বরং একথা বোঝা যায় যে প্রকৃত ও যথার্থ তওবার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতাও শর্ত রাখা উচিত। প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্রততা ও ঘৃণাবস্তু হতে দূরে থাকা প্রয়োজন। "

(আলহাকাম, ১৭ সংস্করণ, ১৯০৪)

ইসলাম একথার প্রতি জোর দেয় যে তোমরা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পবিত্রতা কামনা কর, তাহলে তার জন্য বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শর্ত। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ছাড়া অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে না।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন- اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ (মুসলিম কিতাবুত তাহারাত) আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদের মধ্যে অন্যত্র বলেছেন,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

অর্থাৎ 'নিজের বস্ত্র পরিষ্কার রাখো, শরীর, ঘর, কোণা কোণা এবং প্রতিটি স্থান যেখানে তোমরা বসবাস কর বা তোমরা চলে যাওয়ার পর তাকে নোংরা ময়লা হতে দূরে রাখো। '

(সূরা মুদাসসির:৫-৬) একবার মহানবী (সা.) একজন ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় দেখলেন যখন তার চুল ও দাড়ি এলামেলো হয়ে ছিল। তিনি (সা.) তাকে বললেন, তোমার চুলদাড়ি সঠিক কর। সুতরাং যখন সে চুল ও দাড়ি ঠিক করে এল, তখন হুযুর (সা.) বললেন, এই সুন্দর চেহারা বেশি ভাল না কী মানুষের চুল-দাড়ি এমন উসকো খুশকো হয়ে থাকলে যা দেখে শয়তান ও ভুতের মত মনে হয়।

অতঃপর ঘর, গলি, পথ ইত্যাদি পরিষ্কার রাখারও ইসলামে আদেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে যে, যদি পথে ডাল-পালা,পথর অথবা কোন নোংরা বস্তু পড়ে থাকত, তাহলে মহানবী (সা.) স্বয়ং তা উঠিয়ে একধারে সরিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে বক্তি পথকে পরিষ্কার রাখার প্রতি খেয়াল রাকে খোদা তা'লা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এবং তাকে প্রতিদান দেন।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

"তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহে যেখানে বেশিরভাব ঘরের আবর্জনা সংগ্রহের জন্য যথারীতি কোন ব্যবস্থা থাকে না, ঘরের বাইরে নোংরা ফেলে দেওয়া হয়। অথচ পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা ততটাই আবশ্যিক যতটা ঘরকে পরিষ্কার রাখা। অন্যথায় ঘরের নোংরা বাইরে ফেলে পুরো পরিবেশকে নোংরা করা হচ্ছে। এ কারণে আহমদীদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এমন কোন ব্যবস্থা করা উচিত যেন ঘরের বাইরে নোংরা চোখে না পড়ে।

(খুতবা জুমআ, ২৩ শে এপ্রিল, ২০২৪)

আবার মহানবী (সা.) দাঁতের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বলতেন যে আমার যদি মানুষের কষ্টে পড়ার কথা চিন্তায় না আসত, তাহলে আমি তাদেরকে নির্দেশ দিতাম যে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে দাঁতন করে নিক।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) এ বিষয়ে বলেন, "একটি গবেষণা এক কথাও বলে যে, মানুষ যখন সকালে ঘুম থেকে ওঠে তখন তার দাঁতে ছয় শত বিভিন্ন মসলার অসংখ্য ব্যকটেরিয়া থাকে। মসলা-ই ছয় শত হয়ে থাকে যা দাঁতে লেগে থাকে এবং তার সংখ্যা যে কত তা অজানা। কিন্তু মহানবী (সা.) আমাদেরকে ১৫০০ বছর পূর্বে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঘুম থেকে

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad**

মহান আল্লাহ্র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad**

ওঠো তখন প্রথমে দাঁত পরিষ্কার কর।

(খুতবা জুমআ, ২৩ এপ্রিল, ২০০৪)

শারীরিক পরিচ্ছন্নতার পরিপার্শ্বিকতায় খাবার খাওয়ার পূর্বে ও খাবার খাওয়ার পর হাত ধোয়ার নির্দেশ, খাওয়ার পর কুলকুচি করার নির্দেশ,গোঁফ ছোট রাখা, নাক পরিস্কা করার, নিয়মিত নখ কাটার, বগলের নীচের চুল পরিষ্কার করার, মূত্রত্যাগের পর ধুয়ে ফেলার, নিয়মিত গোসল করার, প্রত্যেক নামাযের জন্য ওজু করা ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ মজুদ রয়েছে।আবার মসজিদ ও মানুষের একত্রিত হওয়ার স্থানে দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য খেয়ে না যাওয়ারও নির্দেশ রয়েছে। আর এ সমস্ত নির্দেশ শরীরের সুরক্ষার নীতি অনুসারে বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের শিষ্টাচারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এটা ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য যে প্রত্যেক সেই বিষয় যা মানুষের শারীরিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জরুরী তাকে প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হতে পূর্ণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পরিচ্ছন্নতা ও শারীরিক পবিত্রতার আদবের উল্লেখপূর্বক বলেন, "আমাদের শারীরিক পবিত্রতা আমাদের আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মধ্যে বহুলাংশে জড়িত। কেননা, আমরা যখন শারীরিক পবিত্রতাকে পরিত্যাগ করে তার কুফল অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ব্যধিসমূহে ভুগতে আরম্ভ করি তখন আমাদের ধর্মীয় আচার সাধনার মাঝেও অনেক ধরণের বিপত্তি হয়ে থাকে। এবং আমরা অসুস্থ হয়ে এমন অকর্মা হয়ে যাই, আমরা কোন ধর্মীয় সেবা করতে পারি না। কিছু দৈহিক কষ্ট সহ্য করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করি। বরং আমরা মানুষের সেবা করার পরিবর্তে নিজেদের শারীরিক অপবিত্রতা ও শরীর সুস্থ রাখার নিয়মকে অগ্রাহ্য করার কারণে অন্যের প্রাণের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে যায়।"

পথের অধিকার ও তার আদবঃ

এখন পথের অধিকার ও তার আদব সম্পর্কে উল্লেখ করতে চলেছি। সারওয়ারে দো আলাম হযরত মুহাম্মদ আরাবী (সা.) আমাদেরকে যেখানে খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা দেখিয়েছেন সেখানে তিনি সাধারণ চলার পথ ও সেখানে তৈরী বসার স্থান সমূহের ব্যবহারের আদবও শিখিয়েছেন যেন মুসলমানদের হাত, জিহ্বা এমনকি দৃষ্টির দ্বারাও যেন কেউ কোন কষ্ট না পায়। তিনি (সা.) বিনা কারণে পথের ধারে বসা হতে আমাদের নিষেধ করেছেন। আরবী إِيَّاكُم والجلوسَ على الطريقاتِ অর্থাৎ সাবধান! রাস্তার উপর বসবে না।

(মুসলিম, কিতাবুস সালাম)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন, "তিনি (সা.) বলেছেন, রাস্তা বসা হতে বিরত থাক। সাহাবাগণ যখন বললেন, আমরা বসতে বাধ্য, কেননা সে যুগে তো ব্যবসা বাণিজ্যের কোন স্থান ছিল না, অফিস ছিল না,যেখানে বসে ব্যবসা বিষয়াদি নির্ধারণ করত তাই তারা বাজারে বসে রাস্তায় বসে। কথা শুনে বললেন, তাহলে পথের হক আদায় কর। যখন বলা হল যে, হে আল্লাহ্‌র রসুলুল্লাহ্ (সা.)! পথের হক কী? তখন তিনি (সা.) বললেন, দৃষ্টি নীচে রাখ।কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক। সালামের উত্তর দাও, এগুলি হল পথের হক বা অধিকার। সৎ কথার উপদেশ দাও, খারাপ কথা হতে বিরত থাক। এই হল পথের অধিকার।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাজাব)

কষ্টদায়ক বস্তুকে পথ থেকে সরানোর ব্যাপারে হুযুর (সা.) বলেন, আমি একজন ব্যক্তিকে বেহেশতে ভ্রমণ করতে দেখেছি। এ তার এই নেকীর বদলা স্বরূপ যে পথের মধ্যে একটি গাছ মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। সে ব্যক্তি সেই গাছটির অসুবিধা সৃষ্টিকারী ডালটিকে কেটে ফেলল।

(মুসলিম, কিতাবুল আদব)

আবার রাস্তার আদবের মধ্যে এটাও আছে যে যদি বাধ্য বাধকতা স্বরূপ পথে দাঁড়িয়েও থাকতে হয়, তাহলে দৃষ্টি যেন নিচে রাখে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন

قُل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم

অর্থাৎ তুমি মোমেনদের বলে দাও যে তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে নিচে রাখে। (সূরা নূর: ৩১)

অনুরূপভাবে নারীদেরকেও পথ দিয়ে যাওয়ার সময় নিজেদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করার এবং দৃষ্টিকে নিচু রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যেমন বলেছে

وَ قُل للمؤمنٰت يغضضن من ابصارهن ويحفَظن فُروجهنّ ولا يُبدين زِينتهن.

অর্থাৎ তুমি মোমিন নারীদের বলে দাও যে তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টি নীচে রাখে। এবং নিজেদের লজ্জা-স্থানসমূহের সুরক্ষা করে এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

(সূরা নূর: ৩২)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: মোমেনদের উচিত নয় যে, তারা অবাধ্য হয় এবং নির্দ্বিধায় নিজেদের দৃষ্টিকে সব দিকে ঘুরিয়ে ফিরে বরং يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِم (সূরা; ৩১) এর উপর আমল করে দৃষ্টিকে নীচু রাখা উচিত এবং দৃষ্টির কারণ সমূহ থেকে বেঁচে চলা উচিত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩)

পথচারীদের একে অপরকে সালাম দিয়ে দোয়া দেওয়ারও নির্দেশ রয়েছে। মহানবী (সা.) সালামকে প্রসার করার শিক্ষা দিয়েছেন।বলেছেন أفشو السلامَ بينكم অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে সালামকে প্রসারতা দাও। মহানবী (সা.) স্বয়ং মুসলিম অমুসলিম সকলকে সালাম প্রদান করতেন। হাদীসে এসেছে যে একবার তিনি (সা.) একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজারী, ইহুদী সবাই বসেছিল। তিনি (সা.) তাদের সকলকে সালাম বলেন। (বুখারী, কিতাবুল ইসতিযান)

নিজেদের মাঝে চর্চা করার আদব:

পরস্পর কথাবার্তা বলার ও চর্চা করারও আদব শিখিয়েছে ইসলাম। জিহ্বা শরীরে সেই অঙ্গ যার মাধ্যমে মানুষ জান্নাত ও দোযখের পথ প্রস্তুত করে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের মধ্যে বলেন

مَا يَلفِظُ مِن قَولٍ اِلَّا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيد

অর্থাৎ মানুষ কোন কথা বলে না কিন্তু তার নিকট একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকে। (সূরা: ১৯) রসুলে করীম (সা.) সাহাবাগণকে বলতেন দোজখের আগুনে মানুষকে উল্টোমুখে তার জিহ্বার কৃতকর্মের ফল নিয়ে যাবে।

(তিরমিযি আবওয়াবুল ইমাম)

মহানবী (সা.) এই নীতিও নির্ধারণ করেছেন যে, "সেই ব্যক্তি মুসলমান যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান সুরক্ষিত"।

(বোখারী-৬৪৮৪)

কথা বলার শিষ্টাচার ও চর্চা করার সবচেয়ে মূল শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শিখিয়েছেন

قولوا قولا سديدا. يُصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم

অর্থাৎ সর্বদা সত্য কথা বলো। যার ফলে তিনি তোমাদের আমলের সংশোধন করবেন, এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন।

(আল আহযাব: ৭১-৭২)

আবার বলেছেন وقولوا للناس حُسناً অর্থাৎ তোমরা মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বলো।

(আল বাকারা: ৮৪)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা নরম কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

(তহা: ৪৫)

لَا تُكثِرُوا الكَلَامَ بِغَيرِ ذِكرِ اللهِ فَتَقسُوَ قُلُوبُكُم فَإِنَّ القَلبَ القَاسِيَ بَعِيدٌ مِّنَ اللهِ

অর্থাৎ- আল্লাহ্‌র যিকর ব্যতিরেকে মাত্রাতিরিক্ত বাগ্মীতা মানুষের হৃদয়কে পাষাণ বানিয়ে দেয়। আর পাষাণ হৃদয় মানুষ অন্যদের তুলনায় আল্লাহ থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থান করে।

(তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ)

বড়দের সামনে উচ্চ স্বরে কথা না বলাও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা.) এর সামনে উচ্চ স্বরে কথা না বলার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে এই শিষ্টাচার শিখিয়েছেন। তিনি বলেন- হে মোমেনগণ! নবী (সা.)-এর স্বর হতে তোমাদের স্বর উঁচু করো না।

(আল হুজরাত: ৩)

কুরআন মজীদের মধ্যে মোমেনদের গুণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নিজেদের ক্রোধ দমনকারী হয় এবং তাদের কথাবার্তা হয় কোমল। এ সম্পর্কে হুযুর (সা.) এর মুবারক নির্দেশ রয়েছে। তিনি (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি বাহাদুর নয় যে অন্যকে আছড়ে ফেলে বরং বাহাদুর সেই যে ক্রোধান্বিত অবস্থায় নিজের উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। (বুখারী, কিতাবুল আদাব)

চরিত্র গঠনে জিহ্বা (বাক-সংযম)-এর এক বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যিক যে সে পরস্পর কথা বলার সময় শিষ্টাচার বজায় রাখা, কঠোর ভাষা প্রয়োগ, বিকৃত নাম ধরে ডাকা,গালাগালি ও অভিসম্পাত করা, পরনিন্দা ও পরচর্চা এবং অপবাদ আরোপ করা থেকে বিরত থাকা।এছাড়াও মানুষকে কটাক্ষ করে দুঃখ দেওয়া এবং উপহাস করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সুস্পষ্ট ও সরল কথা বলা উচিত। মানুষের মুখের কথা যেন মানুষের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি না করে, বরং তা সমন্বয় সাধনকারী হওয়া উচিত। এমনটি হলে মানুষের চরিত্রের সংশোধন হবে আর এমন চরিত্রের অধিকারী হবে যার পরিণামে সে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হবে।

হুযুর (সা.) বলেন: "কুরআন করীম সেই সমস্ত শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় যার জ্ঞান লাভ করা মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য একান্ত জরুরী। এবং প্রত্যেক ধরনের ফাসাদকে (অশান্তিকে) এতটা শক্তির সাথে প্রতিক্রিয়া জানায় যতটা শক্তির সাথে তা বর্তমানে প্রসারিত হয়ে চলেছে। এর শিক্ষা সরল, দৃঢ় ও গ্রহণযোগ্য। যেন প্রাকৃতিক নির্দেশানবলীর একটা আয়নাস্বরূপ এবং মানবপ্রকৃতির এক প্রতিচ্ছবি।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২)

আল্লাহ্‌র প্রিয় খলীফা ও নবী সৈয়্যদানা হযরত আকদস মুহাম্মদ

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

(সা.) আরবের মরুভূমিতে যে মহান বিপ্লব সাধন করেছিলেন তার বুনিয়াদ তিনি (সা.) মানবীয় শিষ্টাচার শেখানোর মাধ্যমে রেখেছিলেন। এর বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"প্রকৃতপক্ষে এই পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁরই জন্য নির্ধারিত ছিল যে তিনি হিংস্র চরিত্র ও চতুষ্পদ প্রকৃতির ন্যায় এক জাতিকে মানবতার শিষ্টাচার শিখিয়েছেন অথবা ভিন্ন কথায় বলা যেতে পারে যে চতুষ্পদকে মানুষে পরিণত করেছেন।

মজলিসের আদব:

এখন মজলিসের শিষ্টাচারের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা ফেরেশতাগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তারা পবিত্র মানুষদের মজলিসে আসেন এবং সেখানে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখনা দিয়ে তাদেরকে ঢেকে নেন। এবং তাদের কল্যাণে সম্পূর্ণ পরিবেশ পূর্ণ হয়ে যায়। যখন মানুষ সেই মজলিস হতে উঠে যায় তখন তারাও আকাশের দিকে উঠে যান। সেখানে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি দেখেছ? তারা উত্তর দেন, আমরা এক মজলিস দেখেছি। যেখানে মানুষ তোমার তসবিহ ও প্রশংসা করছিল। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজন তাদের মধ্য থেকে ছিল না।তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, না সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কেননা هُم قومٌ لا يشقىٰ بِهِم جَلِيسُهُم অর্থাৎ তারা এমন মানুষ যে, তাদের সঙ্গে কোন ব্যক্তি বসে থাকলে সে-ও (পুণ্য হতে) বঞ্চিত হয় না।

(মুসলিম কিতাবুয যিকর)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আপনারাও এই মুহূর্তে এমনই এক মজলিসে বসে আছেন। এই মজলিসের বরকত থেকে অংশ নেওয়ার জন্য সেই সকল শিষ্টাচারগুলিও আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা জরুরী যা ইসলাম আমাদেরকে যথাযথভাবে শিখিয়েছে। আসুন এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত শিষ্টাচার সম্পর্কে জানি, যাতে এই মহান মজলিসের শিষ্টাচারের দাবিসমূহকে আমরা পূর্ণ করতে পারি।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- 'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা মজলিসে জায়গা খোলা রাখিয়া বস' তখন তোমরা জায়গা খোলা রাখিয়া বসিও, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রশস্ততা দান করিবেন। এবং যখন বলা হয় 'তোমরা উঠ' তখন তোমরা উঠিয়া পড়। (সুরা মুজাদিলা: ১২)

অর্থাৎ যতক্ষণ মজলিস থেকে ওঠার জন্য না বলা হবে ততক্ষণ উঠে যাবে না- এই নির্দেশের মধ্যে এই শিক্ষাই নিহিত রয়েছে।

এই জলসায়ও দেখা গেছে যে সভাপতি মহাশয় সভা শেষ হওয়ার ঘোষণা করেন নি, কিন্তু তার আগেই মানুষ উঠে যাওয়া শুরু করে দেন। এটাও মজলিসের আদবের বিরুদ্ধাচারণ। আবার এই জলসা সালানার সমাপ্তি অধিবেশনে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.) এম.টি.এ-র মাধ্যমে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন। এই মজলিসেরও শিষ্টাচারের দাবি হল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রিয় ইমাম নিজ আসনে আসীন আছেন এবং নজম ও তারানা পরিবেশিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তিও যেন দাঁড়িয়ে না পড়ে এবং মজলিসের অসম্মান করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

মজলিসের মধ্যে এমন কার্যকলাপ করা উচিত নয় যা অন্যদের অসুবিধার কারণ হয়। এমনকি যদি হাঁচি আসে তাহলে যতদূর সম্ভব মৃদু আওয়াজে করা উচিত। মহানবী (সা.) এর অভ্যাস ছিল যখন কোন মজলিসে বসা অবস্থায় তাঁর (সা.) হাঁচি আসত তখন নিজ হাত বা কোন কাপড় নিজ মুখের সামনে রেখে দিতেন। এবং যতদূর সম্ভব আওয়াজকে দাবিয়ে দিতেন।

মজলিসে বসে তসবিহ ও তাহমীদ, ইসতেগফার ও দরূদ পাঠ করতে থাকা উচিত। মহানবী (সা.) একবার সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোকেরা! জান্নাতের বাগানসমূহে বিচরণ করার চেষ্টা করতে থাক।জিজ্ঞাসা করা হল জান্নাতের বাগান বলতে কি বোঝায়? তিনি বললেন, যিকর বা খোদা তা'লার স্মরণের মজলিস হল জান্নাতের বাগান। অর্থাৎ যে মজলিসে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করা হয় তা জান্নাতের বাগানের ন্যায় হয়ে থাকে।

মসজিদের আদব:

এখন মসজিদের আদব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করব। মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহ্র যিকর ও তার ইবাদত করার জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করার ও মোনাজাত করার স্থান আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি ও কল্যাণসমূহ প্রকাশের স্থল। মসজিদ প্রকৃতপক্ষে খানা কাবার প্রতিচ্ছায়া। অতএব মসজিদের আদব ও সম্মান করা এবং তার পবিত্রতার প্রতি যত্নবান থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। মসজিদকে সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত জরুরী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-'তাহহিরু বায়তি' অর্থাৎ আমার ঘরকে সর্বদা পাক ও সাফ রাখো। (আল হজ্জ: ২৭)

আবার এটাও মসজিদের আদব যে পরিষ্কার ও পবিত্র হয়ে এবং পরিষ্কার পোশাক পরে ও ওজু অবস্থায় মসজিদে যাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা হুকুম দিয়েছেন يٰبَنِي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

অর্থাৎ হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেক মসজিদের নিকট সৌন্দর্য অবলম্বন কর।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, "মসজিদের পরিবেশকেও ফুল ও বাগিচা ও সবুজ গাছপালা দিয়ে সুন্দর করে রাখা উচিত। তৎসঙ্গে মসজিদের ভিতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতারও বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। বিশেষ করে পাকিস্তান ও ভারতে মসজিদের ভিতরের হলে পরিষ্কার করার নিয়মিত কোন ব্যবস্তা হোক। লাইন উঠিয়ে পরিষ্কার করা উচিত, সেখানে দেওয়ালে খুব কম সময়ে মাকড়সার জাল তৈরী হয়ে যায়, যেগুলি নিয়মিত পরিস্কার করা উচিত। পাখা সহ অন্যান্য সরঞ্জাম মাটিতে পড়ে থাকে, সেগুলিও পরিষ্কার হওয়া উচিত। মোটকথা যে যখন মানুষ মসজিদের ভিতরে যাবে তখন তার মধ্যে চরম মানের পরিচ্ছন্নতার অনুভূতি হওয়া উচিত যে এমন স্থানে এসেছি যা অন্যান্য স্থান থেকে ভিন্ন ও অনন্য।

(খুতবা জুমআ, ২৩ এপ্রিল, ২০০৪)

অনুরূপভাবে মসজিদের আদবের দাবি হর, যখন মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করা হয় তখন মসজিদের ভিতের প্রথমে ডান পা রাখা উচিত এবং প্রবেশের দোয়া পাঠ করা উচিত্ এবং উচ্চস্বরে আসসালামো আলাইকুম বলা উচিত। আর বাইরে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা বাইরে বের করা এবং বের হওয়ার দোয়া পাঠ করা উচিত।

মসজিদে বসে গল্প করা এবং এদিক সেদিকের গালগল্প করা চরম গর্হিত কর্ম এবং মসজিদের আদব ও পবিত্রতার পরিপন্থী। কেননা মসজিদ ইবাদতের জন্য তৈরী করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেন إنما هي لذكر الله تعالىٰ وقراءة القرآن

অর্থাৎ মসজিদ আল্লাহর যিকর এবং কুরআন করীম পাঠের জন্য নির্মিত হয়েছে।

(মুসলিম, কিতাবুত তাহারত)

মসজিদে নামাযীরও একটা মর্যাদা আছে আর তা হল যদি কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় আছে তাহলে পাশে বসা মানুষদের উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়। যে কারণে তার নামাযে ও একাগ্রতা সৃষ্টিতে বাধা হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন: "মসজিদ আল্লাহর স্মরণের জন্য। কিন্তু যিকরে ইলাহির মধ্যে সেই সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত যা মানুষের জাতীয় ঐক্য, রাজনৈতিক চেতনা, জ্ঞান ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য করা হয়। কিন্তু সেই সমস্ত কথা যা লড়াই দাঙ্গা ফাসাদ বা আইন ভঙ্গ করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেটার নাম জাতীয়তা হোক বা রাজনীতি বা ধর্ম, সেগুলিকে মসজিদে করা অবৈধ। অনুরূপভাবে মসজিদে নিজস্ব কথাবার্তা বলাও অবৈধ। কেননা ইসলাম মসজিদকে আল্লাহর ঘর বলে অভিহিত করে। এবং তাকে আল্লাহ্র স্মরণের জন্য বিশেষ করে দিয়েছে।

শ্রোতামণ্ডলী! এই অধম খুবই সংক্ষেপে কিছু শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ করেছে। উক্ত বিষয়াবলীর বিষয়ে আরও বিস্তৃতরূপে আমাদেরকে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেয়। সেই বিবরণ দেখে আমাকে আশ্চর্য হতে হয় যে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসুল (সা.) প্রত্যেক বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথা আমাদের শিখিয়েছেন। জীবনের এই শিক্ষা সমূহ পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের সকলের জন্য দীপ্ত পথপ্রদর্শক।

আমাদের এই যথার্থতাকে বুঝতে হবে যে, এই সমস্ত শিষ্টাচারগুলিই একজন মোমেনের প্রকৃত অলঙ্কার এবং তার প্রকৃত পরিচয়। এটা অসম্ভব যে একজন মোমেনের মাঝে ঈমান তো থাকবে কিন্তু সেই জীবন শিষ্টাচারশূন্য হবে। জীবনের এই ধারাই প্রকৃত ও বিশুদ্ধ চরিত্র লাভের মাধ্যম। তার উত্তম চরিত্র দ্বারা ভূষিত হওয়ার পরেই একজন মানুষ ঈমান ও তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে।

সুতরাং এখন একথার প্রয়োজন আছে যে অমুসলিমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমরা আমাদের জীবনের সেই শিক্ষা যেন ভুলে না বসি, যার ফল এই হবে যে আমরা উত্তম চরিত্র ও ঈমান হতে অন্ধকারে চলে যাব। সুতরং আমাদের উচিত যে, আমরা যেন সেই শিক্ষা সমূহকে নিজেরাও বাস্তবের রূপ দিই এবং নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মকেও তার দ্বারা আলোকিত করি। যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও সেই শিষ্টাচার ও নৈতিকতায় সুসজ্জিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Wasia Begum, Harhari, Murshidabad**

‘খাতমে নবুয়াত’ সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার আকিদা

মনসুর আহমদ মসরূর, এডিটর, সাপ্তাহিক বদর পত্রিকা (উর্দু) কাদিয়ান

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ
الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যেমনটি আপনারা শুনেছেনে যে আমার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে ‘খাতমে নবুয়্যত সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের ইসলামী আকিদা।’

আমি এখনই আপনাদের সামনে ‘খাতামান্নবীঈন সম্পর্কিত আয়াত তিলায়াত করেছি যার অনুবাদ এইরূপ–

‘মুহাম্মদ তোমাদের (ন্যায়) পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নয়। কিন্তু তিনি আল্লাহর রসুল এবং (সর্বোপরি) নবীগণের মোহর। এবং আল্লাহ্ সকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

আআহমদীদের পক্ষ থেকে আহমদীদের উপর অসংখ্য অপবাদ আরোপ করা হয়ে থাকে। সেই অপবাদগুলির মধ্য থেকে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং ভিত্তিহীন। সেটি হল এই যে, সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাত আঁ হযরত (সা,) কে খাতামান্নবীন হিসেবে বিশ্বাস করে না। এটি এমন এক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ যা আমাদের ভীষণভাবে ব্যথিত করে। সর্বপ্রথম আমি খাতামান্নবীঈন সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর স্বীকারুক্তি পেশ করছি। তিনি বলেন–

“আমি খোদার সম্মান ও প্রতাপের নামে শপথ করে বলছি, ‘আমি একথা বিশ্বাস করি যে, আমাদের রসুল মহম্মদ মুস্তফা (সা.) সকল রসুলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি খাতামান্নবীঈন।”

(হামামাতুল বুশরা, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৩৬)

তিনি অন্যত্র বলেন–

“এই স্থানে একথাও স্মরণ রাখাও উচিত যে, আমার ও আমার জামাতের উপর যে অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে যে, আমরা নাকি রসুলুল্লাহ (সা.)–কে খাতামান্নবীঈন বলে বিশ্বাস করি না। এটা আমাদের উপর এক মহা মিথ্যা অভিযোগ। আমরা যে দৃঢ় বিশ্বাস, মারেফাত ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আঁ হযরত (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে বিশ্বাস করি, অন্যদের মাঝে তার লক্ষ ভাগের একভাগও নেই। তারা এর তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ব অনুধাবনই করতে পারে না যা খাতামুল আম্বিয়া–র খাতমে নবুয়তের মধ্যে নিহিত। তারা কেবল তাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে একটি শব্দ শুনে রেখেছে, কিন্তু তার তাৎপর্য সম্পর্কে উদাসীন। তারা জানে না যে, খাতমে নবুয়্যত কি জিনিস এবং এর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? কিন্তু আমরা পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে (যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা ভাল জানেন) আঁ হযরত (সা.) কে খাতামুল আম্বিয়া হিসেবে বিশ্বাস করি আর খোদা তা’লা আমার উপর খাতমে নবুয়্যতের তাৎপর্য এমনভাবে উন্মোচন করেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের যে সুমিষ্ট পানীয় যা আমাদের পান করানো হয়েছে, তা থেকে এক বিশেষ আনন্দ লাভ হচ্ছে তা সেই সমস্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউই উপলব্ধি করতে পারবে না যারা এই প্রস্রবণ থেকে পরিতৃপ্ত হয়েছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৭)

অতএব, যে বিশ্বাস ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মসীহ মওউদ এবং তাঁর জামাত আঁ হযরত (সা.)কে খাতামান্নবীঈন বলে বিশ্বাস করে, তার লক্ষ ভাগের একভাগও সেই সব লোকেরা বিশ্বাস করে না যারা নিজেদেরকে খাতমে নবুয়্যতের রক্ষক বলে দাবি করে।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আঁ হযরত (সা.) কে যখন তারাও খাতামুল আম্বিয়া বলে বিশ্বাস করে এবং আমরাও অনুরূপ বিশ্বাস করি। তবে মতানৈক্য কোন বিষয়টি নিয়ে? বস্তুত মতানৈক্য হল খাতামান্নবীঈন–এর ব্যাখ্যায়। আমরা খাতামান্নবীঈন–এর ব্যাখ্যা করি কুরআন করীমের আয়াত, হাদীস এবং উম্মতের বুজুর্গদের বাণীর আলোকে, যার ফলে আঁ হযরত (সা.)–এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে আমাদের অ–আহমদী ভাইদের মতে খাতামান্নবীঈন–এর অর্থ আঁ হযরত (সা.)– শেষ নবী এবং তাঁর পর কোন প্রকারের কোন নবী আসতে পারে না–এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! নবী তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক– শরিয়ত ধারী নবী: যে সমস্ত নবী শরীয়ত সহ আগমণ করেন। যেমন হযরত মূসা(আ.) এবং আঁ হযরত (সা.) । দুই: শরিয়ত বিহীন নবী বা মুস্তাকিল নবী: যারা কোন শরীয়ত নিয়ে আসেন না।। কিন্তু পূর্বের শরিয়তের সেবার জন্য এসে থাকেন। যেমন হযরত ঈসা (আ.), যিনি মূসীয় শরিয়তের সেবার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) –এর নবুয়্যতে হযরত মূসা (আ.)–এর কল্যাণের কোন দখল ছিল না। বরং সরাসরি তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী হয়ে এসেছিলেন। তৃতীয়, উম্মতি নবী: যে সকল নবী কোন শরিয়তধারী নবীর মাধ্যমে এবং সেই নবীর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পরিণামে নবুয়্যতের পুরস্কার পেয়ে থাকেন। যেমন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), মসীহ ও মাহদী (আ.), যিনি আঁ হযরত (সা.)–এর পূর্ণ দাসত্ব ও অনুসরণের পরিণামে নবুয়তের পুরস্কার লাভ করেছেন।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আমরা কায়োমনোবাক্যে বিশ্বাস করি যে, আঁ হযরত (সা.) শেষ শরীয়তধারী নব, যাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত কোন শরীয়তধারী আসতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনও স্বতন্ত্র নবীও আসতে পারে না। তবে উম্মতি নবী আসতে পারে। অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.)–এর পূর্ণ অনুসরণের পরিণামে একজন উম্মতি নবী, নবুয়তের পদ ও মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের অ–আহমদী ভাইয়েদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সা.)–এর পর কেউ উম্মতি নবী হিসেবেও আসতে পারে না।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! আমরা আমাদের অ–আহমদী ভাইদের প্রশ্ন করতে চাই যে, আঁ হযরত (সা.)–এর পর যদি উম্মতি নবী আসতে না পারে তবে হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নাযেল হবে,তখন তিনি নবী হবেন কি না? এই প্রশ্নে তাদের গায়ে জ্বালা ধরে, কেননা এতে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং কোনও উত্তর খুঁজে পায় না। একদিকে তারা বিশ্বাস করে যে, কোন নবী আসবে না, অপরদিকে ঠিক এর বিপরীতে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, হযরত ঈসা (আ.)–এর আগমণ হবে।

তারা উত্তরে বলে, তিনি তো উম্মতি নবী হবেন। আমরা তাদেরকে বলি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবও উম্মতি নবী হওয়ার দাবি করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–২০, পৃ: ৪১১)

‘উস নূর পর ফিদা হুঁ, উসকা হি ম্যাঁ হুয়া হুঁ/ ওহ হ্যা ম্যাঁ চিজ ক্যা হুঁ ব্যস ফায়সালা এহি হ্যায়।’

অর্থাৎ সেই জ্যোতির প্রতি আমি উৎসর্গিত, তার থেকেই আমার জন্ম। সেটাই প্রকৃত উৎসস্থল, আমার কোনও অস্তিত্ব নেই, এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! যে দ্বারকে আঁ হযরত (সা.) রুদ্ধ করেছেন, পৃথিবীর কোন শক্তি তা খুলে দিতে পারে না। কিন্তু যে দ্বারকে আঁ হযরত (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত রেখেছেন, সেই দ্বারকে এখন কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আঁ হযরত (সা.) শরিয়তধারী নবীর দরজা বন্ধু করে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তিনি স্বতন্ত্র নবীর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। কিন্তু তিনি উম্মতি নবীর দরজা বন্ধ করেন নি, বরং উন্মুক্ত রেখেছেন। আর এই দরজা এখন কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত রূপে উন্মুক্ত থাকবে।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! কুরআন করীমে এমন একটিও আয়াত নেই যা একথা বলে যে, নবুয়তের দরজা এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। বরং একাধিক আয়াত একথা বলে যে, নবুয়তের দরজা উন্মুক্ত আছে।

আল্লাহ্ তা’লা সুরা নিসা–য় বলেন–

মহান আল্লাহ্র বাণী

আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। (আন-নিসা: ২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা’লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ- এই চারটি পুরস্কার আঁ হযরত (সা.) আনুগত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন। অর্থাৎ একজন উম্মতি আঁ হযরত (সা.)এর পরিপূর্ণ অনুসরণের ফলে নবুয়তের মর্যাদায় উপনীত হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা সূরা হজ্জে বলেন-

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

(সূরা হজ্জ: ৭৬)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর চিরাচরিত রীতি ঘোষণা করে বলেন, তিনি সর্বদা ফেরেশতা অথবা মানুষদেরকে নিজের রসুল হিসেবে প্রেরণ করেন।'ইসতাফা' বর্তমানকাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ তিনি নির্বাচিত করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা সূরা আলাফে বলেন-

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(সূরা আরাফ:৩৬)

এই আয়াত বলছে, হে আদম সন্তান! যখনই তোমাদের নিকট রসুল আসবে তোমরা তাকে অস্বীকার করো না, তার প্রতি ঈমান আনবে। যদি কোনও রসুলের আগমণই না হত, তবে এমনটি বলা উচিত ছিল যে, হে আদম সন্তান! ভবিষ্যতে তোমাদের নিকট কখনো কোন রসুল আসবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করেছি মাত্র। আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কাছে সর্বসাকুল্যে ঐ একটিই আয়াই রয়েছে, 'আয়াত খাতামান্নাবীন'। যে আয়াতটি নিয়ে আলোচনা চলছে। আর এর স্বপক্ষে তাদের হাতে একটিও আয়াত নেই। বস্তুত 'খাতামান্নবীঈন' আয়াতও নবুয়তের দরজা উন্মুক্ত রেখেছে, বন্ধ করে দেয় নি।

আমি এখন হাদীসের দৃষ্টি দিব। হাদীস থেকেও জানা যায় যে, নবুয়তের দরজা খোলা আছে, মোটেই বন্ধ হয় নি। আঁ হযরত (সা.) এর পুত্র হযরত ইব্রাহিম যখন মৃত্যু বরণ করে,তখন আঁ হযরত (সা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং বলেন- لَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا অর্থাৎ ইব্রাহিম যদি জীবিত থাকত, তবে সে অবশ্যই সত্য নবী হত।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েজ)

'খাতামান্নবীঈন'-আয়াতটি নাযেল হওয়ার চার বছর পর হযরত ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়। যদি আঁ হযরত (সা.) 'খাতামান্নবীঈন' -এর এই অর্থ বুঝতেন যে তাঁর পর কোন নবী আসবে না, তবে তাঁর বলা উচিত ছিল যে, ইব্রাহিম জীবিত থাকলেও সে নবী হত না, কেননা আমি খাতামান্নবীঈন।

(২) মুসলিম-এর হাদীসে আঁ হযরত (সা.) মসীহকে চারবার নবী বলে সম্বোধন করেছেন। (মুসলিম, বাব সিফাতুদ দাজ্জাল)

৩) আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- اَبُوْبَكْرٍ اَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ نَبِيٌّ - অর্থাৎ আবু বকর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যদি না কেউ নবী না আসে।

(কুনুযুল হাকায়েক ফি হাদীস)

(৪) আঁ হযরত (সা.) বলেছেন-

'সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিহনহাজিন নবুয়ত।'

(মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)

এই হাদীসে আঁ হযরত (সা.) ইসলামের অনাগত ভবিষ্যতের বিভিন্ন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, সেই যুগগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

মিশকাতের প্রণেতা এই হাদীসটি সম্পর্কে লেখেন- "الظَّاهِرُ اَنَّ الْمُرَادَ بِهٖ زَمَنُ عِيْسٰى وَالْمَهْدِيِّ" অর্থাৎ, স্পষ্টতই পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যুগ হবে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর যুগ।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সত্য ভবিষ্যত বক্তা আঁ হযরত (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর জামাত আহমদীয়ায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ ও মাহদী মওউদ -এর মৃত্যুর পর নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের ধারা সূচিত হয়েছে। আর আজ মসীহ ও মাহদীর পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সারা বিশ্বে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আলহামদো লিল্লাহ।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! কুরআন ও হাদীসের আলোকে উম্মতের বুজুর্গগণও এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, কেবল শরীয়তধারী নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়েছে, উম্মতির নবীর দরজা বন্ধ হয় নি। দু-একজন নয়, বরং এমনটা উম্মতের বহু উলেমার আকিদা। সময়ের কথা মাথা রেখে কয়েকজনের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

(১)উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন-

قُوْلُوْا اِنَّهٗ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

অর্থাৎ হে লোকসকল! তোমরা আঁ হযরত (সা.) 'খাতামুল আম্বিয়া' নামে ডাক, কিন্তু একথা বলো না যে,তাঁর পর কোন নবী নেই।

(মুজমাউল বিহার, পৃ: ৮৫, দুররে মনশুর, ৫ম খণ্ড)

(২) দেওবন্দ-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত মৌলানা মহম্মদ কাসিম সাহেব নানোতাবি (রাহে.) বলেন:

"যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, নবী করীম (সা.)-এর যুগের পরেও কোন নবীর জন্ম হয়,তবুও মহম্মদ (সা.)-এর 'খাতমিয়াত'-এর ক্ষেত্রে কোন তারতম্য ঘটবে না।"

(তাহজীরুন নাস, প্রকাশনা-সাহারানপুর, পৃ:৩, সূত্র: খাতমে নবুয়ত কি হাকীকত, পৃ: ১৫৯)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ!

'খাতামান্নবীঈন-এর অর্থ হল আঁ হযরত (সা.)এর আনুগত্য ও অনুসরণের ফলে আধ্যাত্মিকতায় ক্রমশ উন্নতি করে একজন উম্মতি নবুয়তের মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত হতে পারে। এতেই আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় আর এই কারণেই এই উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত নামে অভিহিত হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতে যত নবী গত হয়েছেন, তাদের সকলকে খোদা তা'লা সরাসরি নির্বাচিত করেছিলেন; এতে হযরত মূসার কোন দখল বা কৃতিত্ব ছিল না। কিন্তু এই উম্মতে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণের কল্যাণে শত সহস্র আওলিয়া হয়েছেন এবং (এদের মধ্যে) এমনও হয়েছেন যে উম্মতি ও নবীও বটে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৩০)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে যাবতীয় কল্যাণের উৎস হিসেবে বিশ্বাস করি। যদি এমন কোন প্রদীপ থাকে যার দ্বারা অন্য কেউ আলোকিত হয় না, তবে তা প্রশংসাযোগ্য নয়। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা.) কে আমরা এমন জ্যোতি হিসেবে বিশ্বাস করি, যার মাধ্যমে অন্যরাও জ্যোতি লাভ করে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ:৩১৭)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ!

মহানবী (সা.)-এর পর এমন ব্যক্তির আগমন, যে তাঁর রিসালতের অবসান ঘটাবে, নতুন কিবলা ও নতুন শরীয়ত সঙ্গে আনবে বা শরীয়তের কোনো নির্দেশ পরিবর্তন করবে বা মানুষকে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য থেকে বের করে নিজের আনুগত্যের গন্ডিভুক্ত করবে; বা সে নিজে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে, বা মহানবীর মাধ্যম ছাড়া কোনো কল্যাণ লাভের দাবী করবে - আমরা ক্ষণিকের জন্যও এসব কথাকে বৈধ মনে করি না।

.....কিন্তু, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তাকে এমন মনে করা আমরা কখনও পছন্দ করবো না যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি (সা.) ঐশী কল্যাণ ধারা বন্ধ করে দিয়েছেন! তিনি পৃথিবীর উন্নতির সহায়ক না হয়ে এর অন্তরায় হয়েছেন, যেন খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর পরিবর্তে পৃথিবীকে খোদা-প্রাপ্তির সুমহান সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিত করলেন!

.....মহানবী (সা.) বলেন, হযরত মূসার উম্মতে অনেক মুহাদ্দিস অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং, প্রশ্ন হলো, মহানবীর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তিও যদি মানুষকে কেবলমাত্র মুহাদ্দিসীয়্যতের মর্যাদাই দিতে পারে, তাহলে অন্য নবীদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কিসের, আর তিনি কীভাবে আদম-সন্তানের নেতা ও নবীকুল শিরোমণি সাব্যস্ত হতে পারেন? সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল হওয়ার জন্য তাঁরমাঝে এমন কিছু পরাকাষ্ঠা থাকা আবশ্যক, যা পূর্ববর্তী নবীদের মাঝে পাওয়া যেতো না। আর আমাদের মতে এই পরাকাষ্ঠা কেবল তাঁর মাঝেই ছিল। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মত তাঁদের আকর্ষণী শক্তির মাধ্যমে কেবল মুহাদ্দিসের মর্যাদা পর্যন্ত উপনীত হতে পারতো; কিন্তু, মহানবী (সা.)-এর উম্মত নবুয়ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এটিই তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির পরাকাষ্ঠা, যা এক

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার অবস্থা আদমের অবস্থার অনুরূপ। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (আলে ইমরান:৬০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

মু'মিনের হৃদয়কে তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি প্রেমাকর্ষণে উদ্বেলিত করে।

তাঁর আগমনে এ ধরনের নবুয়তেরও যদি পরিসমাপ্তি ঘটে; তাহলে, তারসাহায্য পৃথিবীর জন্য একটি অভিশাপ সাব্যস্ত হয় আর কুরআন করীমপ্রমাণিত হয় অকল্যাণকর। কেননা, এহেন পরিস্থিতিতে একথা মানতে হবেযে, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ অনেক বড় বড় মর্যাদায় উন্নীত হতো; কিন্তু,তাঁর আগমনের পর তাদেরকে সেসব সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আরমানতে হবে যে, কুরআনের পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী নবুয়তের পদমর্যাদা লাভেসহায়ক ছিল; অর্থাৎ, সেগুলোর অনুসরণে মানুষ সে-মর্যাদায় পৌঁছে যেত,যেখানে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নবুয়তের জন্য মনোনীত করতেন। কিন্তু, কুরআন করীমের শিক্ষা মেনে ও শিরোধার্য করে মানুষ সে মানে পৌঁছতে পারে না। যদি সত্যিই তা হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ইবাদতকারীদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতো এবং তাদের মনোবল ভেঙ্গে যেতো। কেননা, তারা রহমাতুল্লিল আলামীন এবং নবীকুল সর্দারের আগমনে ধরে নিয়েছিল যে,এখন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে; আরআমরা আমাদের প্রিয় বিশ্ব প্রতিপালকের আরো কাছে এসে যাবো। কিন্তু, ফলাফল, নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক, এটি বের হলো যে, তিনি এসে যে দ্বার অবারিত ছিল, তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কোনো মু'মিন মহানবী (সা.) সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা এক মুহূর্তের জন্যও আপন হৃদয়ে স্থান দিতে পারে কী? তাঁর কোনো প্রেমিক ক্ষণিকের তরেও এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে কী? খোদার কসম! তিনি ছিলেন কল্যাণের এক সমুদ্র এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির এক অজেয় গগন। তিনি রহমতের দ্বার রুদ্ধ করেন নি; বরং, অবারিত করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর উল্লিখিত এইমর্যাদা, এ ধরনের নবুয়তের ধারা তাঁর পরও অব্যাহত মনে করতে আমাদের বাধ্য করে। কেননা, এতে তাঁর সম্মান নিহিত; আর একে বন্ধ করার ভেতর রয়েছে তাঁর মর্যাদার অবমাননা। যোগ্য শিক্ষকের যোগ্য ছাত্র হবে – একথা কে না বোঝে! আর কোনো বাদশাহ্র অধীনে বড় বড় শাসক থাকাই হলোবাদশাহ্র বড় হওয়ার প্রমাণ। যদি কোনো গুরুর শিষ্য অযোগ্য হয়, তাকে কেউ যোগ্য গুরু বলতে পারে না। যদি কোনো বাদশাহ্র প্রজা নিম্নমানের মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে তাকে কেউ বড় বাদশাহ্ বলতে পারে না। এ পৃথিবীতে রাজাধিরাজ একটি সম্মানজনক উপাধি, অসম্মান বা তাচ্ছিল্যের নয়; একইভাবে সেই নবী সবচেয়ে বড়, যার অনুসারী নবুয়তের মর্যাদা লাভ করে আর তারপরও উম্মতিই থাকে।

(দাওয়াতুল আমীর, পৃ: ৪৪-৪৮)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! 'খাতামান্নবীঈন' আয়াত নাযেল হওয়ার প্রেক্ষাপট এইরূপ যে, মক্কার কাফেররা যখন আঁ হযরত (সা.)-কে পুত্র সন্তানহীন হওয়ার কারণে কটাক্ষ করত। এমনকি তারা আঁ হযরত (সা.) কে নিঃসন্তান পর্যন্ত বলত। নাউযুবিল্লাহ। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত নাযেল করেন- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (সূরা কাউসার) অর্থাৎ অতঃপর খাতামান্নবীঈন আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেখানে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ তোমাদের ন্যায় পুরুষদের জৈবিক পিতা নন ঠিকই, কিন্তু তিনি 'খাতামান্নবীঈন' হওয়ার সুবাদে অবশ্যই মোমেনগণ ও নবীকুলের আধ্যাত্মিক পিতা।

খাতামান্নবীঈন -এ যে 'ওয়ালাকিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা বৈপরীত্য বা সংশোধন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ পূর্বের বাক্যে যদি কোন সংশয় তৈরী হয়, তবে 'লাকিন' -এর পরে দ্বিতীয় বাক্যে সেই সংশয় নিরসন করা হয়। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের জৈবিক পিতা নন। পরবর্তী বাক্যে 'লাকিন'-এর মাধ্যমে এই সংশয় দূর করা হয়েছে যে, তিনি জৈবিক পিতা নন ঠিকই, কিন্তু তিনি খাতামান্নবীঈন অর্থাৎ আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের আধ্যাত্মিক পিতা।

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! কতই না সুস্পষ্ট ও সাবলীল বাণী আর উৎকৃষ্ট বর্ণনা। একদিকে জৈবিক পিতা হওয়ার অস্বীকৃতি, অপরদিকে আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের আধ্যাত্মিক পিতা হওয়ার স্বীকারুক্তি।

এখন অ-আহমদীদের অনুবাদ শুনুন। তারা অনুবাদ করে, মুহাম্মদ তোমাদের ন্যায় পুরুষদের জৈবিক পিতা নন, কিন্তু তিনি শেষ নবী। এটা নিতান্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অর্থহীন কথা হয়ে দাঁড়ায় যেটাকে সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান মহান খোদার বাণী বলা যেতে পারে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর জৈবিক পিতৃত্বকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক পিতৃত্বকে এর থেকে পৃথক করেছেন। যদি একথা স্বীকার করা হয়, যেমনটি আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কোন জৈবিক পুত্র নেই, আর আধ্যাত্মিক পুত্রও নেই, তবে মাআয আল্লাহ্, এরা তো আঁ হযরত (সা.) কে নিঃসন্তান বলে আখ্যায়িত করছে। কিন্তু এমনটি নয়। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ!

খাতাম-এর আরও একটি অর্থ সীল মোহর, সত্যায়নের জন্য চিঠি বা সংশাপত্রে যে সীলমোহরে ছাপ দেওয়া হয়। এই অর্থে 'খাতামান্নবীঈন'এর অর্থ দাঁড়াবে তিনি (সা.) কেবল নবী নন, বরং নবীগণের সীলমোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন নবী তাঁর সীলমোহর ব্যতিরেকে সত্য হিসেবে গণ্য হবে না। অর্থাৎ তিনি কেবল নবী নন, বরং নবীদের কষ্টিপাথর। আর এই শ্রেষ্ঠত্ব অন্য কোনও নবীর নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

মহা সম্মানিত আল্লাহ্ আঁ হযরত (সা.) কে খাতাম উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁকে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠার জন্য মোহর দান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে মোটেই দেওয়া হয় নি। এই কারণেই তাঁর নাম হয়েছে 'খাতামান্নবীঈন। অর্থাৎ তাঁকে অনুসরণ করলে নবুয়তের মর্যাদা লাভ হয় আর তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা হল একজন নবী তৈরী করেন আর এই পবিত্রকরণ শক্তি অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নি।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ১০০)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ!

যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) খাতামান্নবীঈন-এর যে অর্থ আমাদেরকে শিখিয়েছেন তার দ্বারা আঁ হযরত (সা.)এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এমনটি নয় যে, তিনিই একাই এমন অর্থ করেছেন, উম্মতের বুজুর্গগণও সেই অর্থ করেছেন এবং তিনি সেই অর্থগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(১) সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

সন্দেহ নেই, সত্য এটাই যে, প্রকৃত অর্থে কোন নবীও আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র ঔৎকর্ষসমূহের সমভাগী হতে পারেন না। বরং, এক্ষেত্রে এমনকি ফেরেশতাগণের সমকক্ষ হওয়ারও কোন সুযোগ নেই, অন্য কারো কথা তো দুরস্থান যে, সে আঁ হযরত (সা.)-এর কোনও উৎকর্ষতার কোনও অংশীদার হয়।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৮)

আমাদের রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা সমগ্র উম্মতের সামগ্রিক অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার চায়তে বেশি। বরং আমার ভাইয়েরা যদি দ্রুত উত্তেজিত না হয়, তবে আমার এটাই বিশ্বাস যা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি- সকল নবীগণের অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আঁ হযরত (সা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার সমকক্ষ নয়।

(ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭)

৩) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: অতীতে যে সকল নবী ও কিতাব গত হয়েছে, সেগুলির পৃথকভাবে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা মহম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত সেই সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে এবং তা সকল নবীকে ছাপিয়ে গেছে। এখন এই পথ ছাড়া অন্য সকল পথ বারিত হয়েছে। যে সকল সত্যতা খোদা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, তা এরই মধ্যে নিহিত। এরপর নতুন কোন সত্যতা আসবে না, আর পূর্বেও এমন কোন সত্য ছিল না যা এর মধ্যে বিদ্যমান নয়। অতএব, এই নবুয়তে সকল নবুয়তের অবসান হয়েছে এবং হওয়া উচিত ছিল।"

(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ৩১১)

এটিই হল খাতমে নবুয়তের পরিচয়। আঁ হযরত (সা.)-এর আধ্যাত্মিক মর্যাদা অতীব উচ্চ, এতটাই যে, কোন নবী তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদার কাছেও পৌঁছতে পারবে না। এমনকি ফিরিশতাদেরকেও এখানে বিচরণ করার তৌফিক ও অনুমতি দেওয়া হয় নি। খাতামান্নবীঈন-এর এই অর্থ যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন, উম্মতের পুণ্যবান বুজুর্গগণও সেই অর্থই বর্ণনা করেছেন।

১) হযরত শেখ আবু আব্দুল্লাহ্ মহম্মদ আল হাসান আল হাকীম তিরমিযি

মহান আল্লাহ্র বাণী

তাহারা কি জানে না যে,তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন? (আল বাকারা: ৭৮)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal
From: Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

মহান আল্লাহর বাণী

তোমরা সকল নামাযের, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের সংরক্ষণ কর, এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া দণ্ডায়মান হও।

(আল বাকারা: ২৩৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

(মৃত্যু–৩০৮ হিজরী) বলেন–

আমার মতে খাতামান্নবীঈন এর অর্থ হল, নবুয়তের সকল ঔৎকর্ষ ও পরাকাষ্ঠা মহম্মদ মুস্তফা (সা)–এর মধ্যে সমন্বিত হয়েছে। আর এগুলিকে একত্রিত করার জন্য খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.)–এর হৃদয়কে পাত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

(কিতাব খাতামুল আওলিয়া, পৃ: ৬৪১)

২) হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি (মৃত্যু: ৫৪৪ হিজরী) বলেন:

'বুদ্ধির মর্যাদা হল, এটি সমস্ত কিছুর শেষ কথা আর শেষ হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। দেখ, আমাদের রসুলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নবীঈন হওয়ার পরই শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন।

(তফসীরে কবীর রাজি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩১)

৩) হযরত আবু সাঈদ মুবারক ইবনে আলি মাহজুমি (মৃত্যু: ৫১৩) বলেন:

বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ডে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা মানুষের। যখন সে উন্নতির শিখরে পৌঁছয়, তখন তার মধ্যে পরম ব্যপ্তির সাথে উক্ত মর্যাদাগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাকেই বলা হয় পূর্ণ মানব। আর আমাদের নবী (সা.)–এর মাঝে পূর্ণাঙ্গরূপে সকল ঔকর্ষের পরাকাষ্ঠা এবং মর্যাদার বিস্তৃতি ঘটেছে। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) খাতামান্নবীঈন।

(তোহফায়ে মুরসিলা শরিফ, পৃ: ৫১)

পরিশেষে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্যে ইতি টানব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

"অন্য সকল নবীগণের দ্বারা যে সমস্ত মোজেযা প্রদর্শিত হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সেই মোজেযাগুলিরও পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। কিন্তু, আমাদের নবী (সা.)–এর মোজেযাগুলি এমন যে, সেগুলি প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সময়ে এই তাজা ও জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে চলেছে যে, আঁ হযরত (সা.)ই জীবন্ত নবী এবং প্রকৃত জীবন সেটাই যা তাঁকে দান করা হয়েছে এবং অন্য কাউকেই দান করা হয় নি। এজন্য, তাঁর (সা.) শিক্ষাই জীবন্ত শিক্ষা, এবং সেই শিক্ষার সুফল ও কল্যাণ আজও তেমনি বিদ্যমান রয়েছে, যেমন তা ছিল তেরশ বছর পূর্বে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৭)

তিনি (আ.) আরও বলেন:

এই হল খাতমে নবুয়ত সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার ইসলামি আকিদা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের অ–আহমদী ভাইয়েদেরও এর তাৎপর্য অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সম্মান রক্ষা করা উচ্চ মর্যাদার কাজ। তথাপি একথা দৃষ্টি রেখে যে, তবলীগের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি হবেনা বা জাতি পর্যায়ের কিম্বা শরীয় বিধান অথবা ধর্মীয় কোন কাজের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজের স্বার্থে কোন ব্যক্তি যদি নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে দেয় এবং তার উপর থাকা অভিযোগ নিয়ে চিন্তিত হয় না– নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, যে কিনা, সদুদ্দেশ্যে হলেও, নিজের সম্মান রক্ষার দাবি করে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ বলেন: হযরত ইউসুফ (আ.) কে যখন বাদশাহ ডেকে পাঠালেন, তখন তাঁর নিকট দুটি পথই খোলা ছিল। হয় তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসতেন, নচেত প্রথমে নিজেকে অভিযোগমুক্ত করে বের হতেন। এই দুটি কাজ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি কাজই পুণ্যকর্মে পর্যবসিত হত অথবা দুটিই মন্দকর্মে। কারণ হযরত ইউসুফ (আ.) যদি অহংকার ও দাম্ভিকতার বশে এমনটি করতেন, তিনি যদি বলতেন, প্রথমে নিজের দোষ স্বীকার করুন তবেই আমি বের হব–তবে এটি পাপ হত। অনুরূপভাবে যদি এই পন্থা অবলম্বন করতেন, নিজের সুখ–স্বাচ্ছন্দের জন্য কোন ধর্মীয় উপযোগীতা দৃষ্টিতে না রেখেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসতেন, তবে সেটিও পাপ হত। কিন্তু তিনি বের হতে অস্বীকার করেন নি। তিনি বের হতে অসম্মতি জানান, এজন্য নয় যে তিনি অহংকারী ছিলেন, বরং যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন, কেবল এজন্য যে তাঁর এক উপকারী বন্ধু পাছে এই সংশয়ে নিপতিত হয় যে ইউসুফ (আ.) তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই অসামান্য প্রক্ষোভের কারণে তাঁর এই কাজটি উৎকৃষ্ট মানের পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু চতুর্থ একটি দৃষ্টিভঙ্গিও আছে যার কারণে তাঁর ততক্ষণাত বেরিয়ে আসা পুণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি রসুলুল্লাহ (সা.) অবলম্বন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি হল নিজের উপর ন্যস্ত নবুয়্যতের গুরু দায়িত্ব পালনের চিন্তা। একজন নবী কিম্বা শিক্ষক খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে তার সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়াই কর্তব্য। এমনকি যদি সম্মান এবং খ্যাতিও বিসর্জন দিতে হয়, তবু কোন পরোয়া করেন না। একজন নবী যদি কয়েদখানায় বন্দী থাকেন,তবে সেক্ষেত্রে হয় তিনি তবলীগ করতে পারবেন না, কিম্বা তা সীমিত আকারে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে নিজের স্বাধীনতার বিষয়ে ভাবিত হওয়া তার অনেক বড় ত্যাগস্বীকার হবে যদি সে নিজেকে দোষমুক্ত হিসেবে প্রমাণ না করে করে বন্দীত্ব থেকে বেরিয়ে আসে আর নিজের কাজের তুলনায় নিজের সম্মানের পরোয়া না করেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.– হযরত ইউসুফ (আ.)এর ঘটনার উল্লেখ করার নিজের জন্য শেষোক্ত পন্থাটি পছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন– যতসময় ইউসুফ বন্দীদশায় কাটিয়েছেন, আমি যদি ততটুকু সময় বন্দী থাকতাম, তবে আহ্বানকারীর কথা আমি মেনে নিতাম। (বুখারী ও মুসলিম, আবু হুরাইরাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত) মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এ আবু হুরাইরাহ (রা.)–র পক্ষ থেকেই বর্ণিত হয়েছে

لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ

অর্থাৎ– আমি অবিলম্বে স্বীকার করে নিতাম। আমাকে প্রথমে অভিযোগ মুক্ত কর –এমন ওজর আপত্তি মোটেই করতাম না। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে সক্ষম যে, এই দুটি মর্যাদার মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠতর যেটি রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। কেননা, যদিও সম্মান রক্ষা করা উচ্চ মর্যাদার কাজ। তথাপি একথা দৃষ্টি রেখে যে, তবলীগের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি হবেনা বা জাতি পর্যায়ের কিম্বা শরীয় বিধান অথবা ধর্মীয় কোন কাজের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজের স্বার্থে কোন ব্যক্তি যদি নিজের সম্মান বিসর্জন দেয় এবং তার উপর থাকা অভিযোগ নিয়ে চিন্তিত না থাকে– নিঃসন্দেহে এমন ব্যক্তি সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত, যে কিনা, সদুদ্দেশ্যে হলেও, নিজের সম্মান রক্ষার দাবি করে। (তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৬)

১০ পাতার পর..

সময়মতো যোহর ও আসরের নামায আদায় করা যায় নি। এমনকি সূর্যাস্ত হয়ে যায়। তখন মহানবী (সা.) সময়মত নামায পড়ার সুযোগ না পেয়ে অস্থির হয়ে বলেন, হে আল্লাহ! যারা আমাদেরকে সঠিক সময়ে নামায আদায় করতে দিল না তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দিও। অতঃপর তিনি সাহাবীদের একত্র করে কাযা নামায পড়ান। (বুখারী)

*আজকাল আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন যুদ্ধের আলোকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর পবিত্র জীবনী বর্ণনা করছেন। একটি যুদ্ধের উল্লেখ করে তিনি বলেন–

"কারো সাথে মহানবী (সা.)–এর কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। অর্থাৎ, তাঁর অন্তরে সেই মুশরিকদের জন্য কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না, বরং যারা আল্লাহ্‌র ধর্মকে মেটাতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল..... অতঃপর তিনি যুদ্ধের নীতি এবং নিয়ম নির্ধারণ করেন। চুক্তি করেন এবং চরমভাবে তার প্রতি আমলও করেন। আজকের বিশ্বের মত নয় যে নিয়ম–কানুন অসংখ্য তৈরী হয়েছে, কিন্তু আমল করা হয় না, বরং দ্বৈত মানদণ্ড নির্ধারণ করে রেখেছে।

(খুতবা জুমা, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

*হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) খেলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে জলসা সালানা উপলক্ষ্যে যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)–এর উত্তম আদর্শ বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি একেত্রে বলেন, "মহানবী (সা.)–এর কয়েকটি যুদ্ধাভিযানের প্রতি দৃষ্টি দিলে নবীজির দয়ার চমৎকার ক্ষমতার উপর আশ্চর্যজনক আলোকপাত হয়, যা একজন সেনাপতি হিসেবে তাঁর চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) আদ্যোপান্ত একজন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, বরং একজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন যার হাতে উন্নত নৈতিকতার পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। উন্নত চরিত্রের সর্বদা পতাকা উত্তোলিত রাখার যে মহাসংগ্রাম তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন তা এমন এক অনন্ত প্রচেষ্টা যা সাধারণ সময়ের পাশাপাশি যুদ্ধ অবস্থায়ও অব্যাহত ছিল। ..... মহা বিজয়ী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) প্রত্যেকটি নৈতিক যুদ্ধে মহান বিজয় লাভ করেছিলেন।"

(বক্তৃতা জলসা সালানা আয খিলাফত, পৃ: ৩৩৪-৩৩৫)

আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি, তিনি যেন বর্তমান মুসলিম সংগঠনগুলোকে মহানবী (সা.)-এর এই বিশুদ্ধ উদাহরণগুলো সর্বদা তাদের সামনে রাখার তৌফিক দান করেন। আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi
From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

জুমআর খুতবা

(মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব নাসের)–এর ন্যায় কোন দৃষ্টান্ত অন্তত আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি। আল্লাহ্‌র ভান্ডারে কোনও কিছুর অভাব নেই। আল্লাহ্ করুন তাঁর মত আরও অনেক দৃষ্টান্ত জন্ম নিক। এমন বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান ও তাকওয়ার পথে বিচরণকারী এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে আহমদীয়াকে দান করুন।

কতিপয় সেনাভিযানের প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)–এর জীবনী।

জামাতের এক বুজুর্গ ও অসাধারণ আলেম, খিলাফতের প্রতি নিবেদিত, দ্বীনের অসামান্য সেবক এবং খিলাফতের মহান সহায়ক, পূর্ণ আনুগত্যকারী ও বিশ্বস্ত সৈনিক সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব–এর স্মৃতিচারণ। এছাড়াও কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী করাচির ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেব শহীদ–এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৬ই মে, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (১৬ হিজরত ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি আজও মহানবী (সা.) পরিচালিত সারিয়া বা সেনাভিযান সম্পর্কে আলোচনা করব। আমার কাছে যেসব নোট রয়েছে, তাতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে এই অভিযানগুলোরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে। এরপর আমি অন্য বিষয় আলোচনা করব।আবু কাতাদা আনসারীর অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা খাযেরা অভিমুখে ছিল। এই অভিযান অষ্টম হিজরীরর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন আবু কাতাদা। খাযেরা মদীনা মুনওয়ারার উত্তর–পূর্বে বনু মুহারিবের অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এটিকে তিহামা অঞ্চলও বিবেচনা করা হতো, যা নজদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বনু গাতাফানের একটি শাখা বসবাস করত। বনু গাতাফান ইসলামের বিরোধিতায় নিরন্তর লিপ্ত ছিল এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করত না। নজদ অঞ্চলের খাযেরায় বসবাসকারী বনু গাতাফান মদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অনিষ্ট ছড়াতে ব্যস্ত ছিল।

(গাযওয়াত ও সারিয়্যা, প্রণেতা– আজহার ফরিদ শাহ, পৃ: ৪৩৮)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি হাদরাদ আসলামী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি হযরত সুরাকা বিন হারেসার মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে আমি যা কিছুই অর্জন করেছি, সেসব জিনিসপত্রের মধ্যে আমার কাছে এমন কিছু নেই যা আমার কাছে এই মর্যাদার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। আমি তার মোহরানা দুইশ দিরহাম নির্ধারণ করেছিলাম, কিন্তু আমার কাছে তাকে দেবার মতো কিছুই ছিল না। আমি বললাম, এই মোহরানা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই পরিশোধ করাবেন। আমি মহানবী (সা.)–এর কাছে যাই এবং তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বলি। তিনি (সা.) বলেন, তুমি মোহরানা কত নির্ধারণ করেছ? আমি বললাম, দুইশ দিরহাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)। আমাকে তার মোহরানা পরিশোধে সাহায্য করুন। তিনি (সা.) বলেন, এখন আমার কাছে এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু আমি আবু কাতাদাকে কিছু লোকের সাথে একটি সেনা অভিযানে পাঠানোর ইচ্ছা রাখি। তুমি কি এতে যেতে চাও? আমি আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তোমার স্ত্রীর মোহরানা গনিমত হিসেবে দান করবেন। আমি বললাম, ঠিক আছে। তারপর আমরা রওয়ানা হই। আমরা মোট ষোলোজন ছিলাম। হযরত আবু কাতাদা আমাদের নেতা ছিলেন। তিনি (সা.) আমাদেরকে নজদের অভিমুখে বনু গাতাফান গোত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তিনি (সা.) নির্দেশ দেন, তোমরা রাতে যাত্রা অব্যাহত রাখবে ও দিনে লুকিয়ে থাকবে এবং আকস্মিক আক্রমণ করবে আর নারী ও শিশুদের হত্যা করবে না। তারপর আমরা বের হই এবং গাতাফানের (বসতির) একদিকে পৌঁছে যাই।

(সূত্র: কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৪)

যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন আবু কাতাদা আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি দুইজন দুইজন করে জোড়া বানিয়ে দেন এবং বলেন, প্রত্যেকেযেন তার সঙ্গী থেকে পৃথক না হয়, যতক্ষণ না সে শহীদ হয় অথবা আমাকে তার খবর দেয়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যেন আমার কাছে এমন অবস্থায় না আসে, যাকে তার সাথি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, আমি দ্বিতীয়জন সম্পর্কে জানি না; অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে। আর যখন আমি তকবীর বলব তখন তোমরাও তকবীর বলবে, এবং যখন আমি আক্রমণ করব তখন তোমরাও আক্রমণ করবে। আর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে বেশি দূরে যাবে না। অর্থাৎ বেশি পিছু ধাওয়া করবে না; যদি শত্রু পালিয়ে যায় তবে তাকে যেতে দেবে। অতএব আমরা সেখানে উপস্থিত লোকদের ঘিরে ফেললাম। হযরত আবু কাতাদা খাপ থেকে নিজের তরবারি বের করেন এবং তকবীর দেন, আমরাও আমাদের তরবারি খাপ থেকে বের করে তার সাথে তকবীর দিই। এরপর আমরা সেখানে উপস্থিত লোকদের ওপর আক্রমণ করি।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮৫–১৮৬)

হঠাৎ আমি দেখি, তাদের মধ্য হতে একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি খোলা তরবারি নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল এবং বলছিল, হে মুসলমানরা! জান্নাতের দিকে এসো। আমি তার পিছু নিই। সে কাফির ছিল এবং বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে বলছিল, তোমরা জান্নাত চাও তো? তাহলে এসো জান্নাতের দিকে! সে 'জান্নাত, জান্নাত' বলে আমাদের ঠাট্টা করছিল। আমি বুঝতে পারলাম, সে ফিরে আসবে। আমি তার পেছনে যাই। আমার সঙ্গী বলল, দূরে যেও না, আমাদের নেতা আমাদেরকে পিছু ধাওয়া করতে নিষেধ করেছেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি তাকে ধরে ফেলি এবং তার নগ্ন পিঠের দিকে তির নিক্ষেপ করি। সে পুনরায় বলে, হে মুসলমানরা! তোমরা জান্নাতের নিকটবর্তী হও। পুনরায় বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে একথা বলে। আমি তাকে লক্ষ্য করে আরেকটি তির নিক্ষেপ করি এবং তাকে হত্যা করি। এরপর আমি তার তরবারি নিয়ে নিই। আমার বন্ধু আমাকে ডেকে বলছিল, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আবু কাতাদার কাছে যাই; তিনি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং আমি তাকে বলে দিয়েছি। আমি বললাম, আমীর কি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ, এবং তিনি আমার ও তোমার ওপর রাগ করছিলেন। সে বলল, তিনি আমাকে জানান যে, মুসলমানরা গনিমতের সম্পদ সংগ্রহ করেছে এবং তাদের নেতাদের হত্যা করেছে। অতএব আমি হযরত আবু কাতাদার কাছে যাই, তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করেন। আমি বললাম, আমি একজন লোককে হত্যা করেছি যার অবস্থা এমন ছিল এবং সে এই এই কথা বলছিল। তারপর আমরা পশুদের হাঁকাই এবং মহিলাদের বন্দি করি। আমাদের তরবারিগুলো পালান বা হাওদার সাথে ঝোলানো ছিল। সকাল হলে আমার উট থেকে ফোটা ফোটা রক্ত পড়ছিল। একজন মহিলা, যে হরিণের মতো বারবার পিছনে তাকাচ্ছিল এবং কাঁদছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখছ? সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি একজন ব্যক্তিকে খুঁজছি। যদি সে জীবিত থাকত, তাহলে আমাদেরকে তোমাদের হাত থেকে রক্ষা করত। আমার মনে হলো, সে সম্ভবত সেই লোকটাই যাকে আমি হত্যা করেছি এবং তারই তরবারিটি হাওদার সাথে ঝুলছে। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম, এটা তার তরবারির খাপ। তার কাছে সেই ব্যক্তির তরবারির খাপ ছিল। এটাতে (তরবারি) ঢুকিয়ে দেখো, যদি তুমি সত্য বলে থাক। আমি (তাতে তরবারি) ঢুকালে এটি পুরোপুরি ঢুকে যায়। তারপর সেই মহিলা কাঁদতে থাকে। এরপর আমরা মহানবী (সা.)–এর নিকট উট এবং ছাগল নিয়ে আসি।

(কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৪–২২৫)

এক বর্ণনা অনুযায়ী, সাহাবীরা এই অভিযানে পনেরো রাত বাইরে ছিলেন এবং দুইশ উট, এক হাজার ছাগল এবং অনেক বন্দি নিয়ে এসেছিলেন। তা থেকে খুমুস (অর্থাৎ পঞ্চমাংশ) আলাদা করা হয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৮৭)

এবং প্রত্যেকের ভাগে বারোটি উট এসেছিল। একটি উটকে দশটি ছাগলের সমান ধরা হয়েছিল। অপর এক রওয়ায়েত অনুযায়ী, এই অভিযানে দুইশ উট, দুই হাজার ছাগল এবং বহু বন্দি গনিমত হিসেবে লাভ হয়েছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩) (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০১)

অপর একটি সেনাভিযান আবু কাতাদার নেতৃত্বে ইযাম উপত্যকা অভিমুখে পরিচালিত হয়েছে। এটি ৮ম হিজরীর রমযান মোতাবেক জানুয়ারি ৬৩০ সালে সংঘটিত হয়েছিল। ইযাম মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে পূর্ব দিকে নজদ অঞ্চলে একটি উপত্যকা, যেখানে গাতাফান গোত্রের একটি শাখা বনী আশজাআ বসবাস করত।

এই অভিযানের কারণ হলো, যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের জন্য মক্কা অভিমুখে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি (সা.) হযরত আবু কাতাদাকে ইযাম উপত্যকার দিকে প্রে রণ করেন যা মদীনা থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত, অথচ মক্কা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত; যেন লোকেরা মনে করে, মহানবী (সা.) মক্কার দিকে নয় বরং ইযামের দিকে যাচ্ছেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি হাদরাদ। হযরত আবু কাতাদার সাথে আটজন সাহাবী ছিলেন যাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মুহাইলেম বিন জাসামা লাইসী। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি হাদরাদ বর্ণনা করেন, যখন আমরা ইযাম উপত্যকায় পৌঁছি, তখন সেখানে আমের বিন আযবাত আশজাই আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি তাদের কাছে এসে ইসলামী পদ্ধতিতে তাদেরকে সালাম দেয়। এতে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে হাত তোলা থেকে বিরত থাকে, কারণ সে ইসলামী পদ্ধতিতে সালাম দিয়েছিল, তাই ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তারা (আক্রমণ থেকে) বিরত থাকে। কিন্তু হযরত মুহাইলেমের এই ব্যক্তির সাথে অতীতের কোনো বিবাদ ছিল, তাই তিনি আমের বিন আযবাতের ওপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে ফেলেন এবং তার সামগ্রী ও উট নিজের দখলে নিয়ে নেন। এছাড়া অন্য কোনো দলের সাথে সাহাবীদের সংঘর্ষ হয় নি। যেহেতু তাদের শুধু মুশরিকদের মনোযোগ ভিন্ন দিকে সরানোর জন্য পাঠানো হয়েছিল, তাই সাহাবীরা সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরই মাঝে তারা জানতে পারেন, মহানবী (সা.) মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন, তাই তারাও সেই দিকে ঘুরে যান আর পথিমধ্যেই মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। যখন তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন, তখন তারা উক্ত হত্যার সমস্ত ঘটনা তাঁকে (সা.) অবগত করেন। ইতিহাসের বইয়ে লেখা আছে, (তখন) এই আয়াত নাযেল হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء:95)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সফর করো, তখন ভালোভাবে তদন্ত করে নাও। আর যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে এ কথা বলো না যে, তুমি মুমিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ চাও। আল্লাহ্‌র কাছে তো প্রচুর গনিমত রয়েছে। এর আগে তোমরাও এমনই ছিলে। তারপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, তোমরা ভালোভাবে তদন্ত করে নাও। নিশ্চয় তোমরা যা করো, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(সূরা নিসা: ৯৫)

অর্থাৎ এতে নিষেধ করে বলা হয়েছে, যে সালাম করে তার সাথে কোনো বিবাদ করবে না, তার সাথে কোনো কঠোরতা করবে না, তাকে হত্যা করবে না বা শাস্তি দেবে না।

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, এই অভিযান হিজরী ৮ম বছরে হয়েছিল, কিন্তু এই আয়াতটি হলো সূরা নিসার এবং এই রেওয়ায়েতটি সীরাত ইবনে কাসীরে লেখা আছে। আর সূরা নিসা সম্পর্কে বেশিরভাগ লোকের মতৈক্য হলো, এটি হিজরতের তৃতীয় থেকে পঞ্চম বছরের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৪৫) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১১১) (সীরাত ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৩) [তারজুমা কুরআন করীম, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.), পৃ: ১২৩]

এটা হতে পারে, এই ঘটনা জানার পর মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠকরে অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকবেন। যাহোক, এই বিষয়ে তিনি তাদেরকে এই আয়াতের বরাতে সতর্ক করেন।

এরপর আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ আশা করি মক্কা বিজয়ের আলোচনা শুরু হবে।

এখন আমি জামাতের একজন প্রবীণ ও পুণ্যবান আর বিশিষ্ট আলেম, খিলাফতের প্রতি নিবেদিত, ইসলামের অতুলনীয় খাদেমের কথা উল্লেখ করব, যিনি সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেছেন। একইভাবে আরেকজন নিবেদিত প্রাণ, নিষ্ঠাবান আহমদী যিনি এই দিনগুলোতে কারাবন্দি ছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং যে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে তা থেকে জানা যায়, এই দিক থেকে তার শাহাদাতের মর্যাদা রয়েছে।

যাইহোক, প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে মুকাররম সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেবের, যিনি হযরত সৈয়দ মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)-র পুত্র ছিলেন। তিনি সম্প্রতি ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি হযরত আম্মাজান নুসরাত জাহান বেগম সাহেবার ভাতিজা ছিলেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ও হযরত মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবার জামাতা। তার মায়ের নাম ছিল সালেহা বেগম। তিনি হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের পৌত্র ছিলেন; তার মায়ের নামও সালেহা ছিল, যিনি হযরত পীর মনজুর মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন, যিনি হযরত সুফি আহমদ জান সাহেব লুধিয়ানভির পুত্র ছিলেন। সৈয়দ মাহমুদ আহমদ সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ান থেকে লাভ করেন, তারপর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ করেন। ১৯৪৪ সালের মার্চে তার পিতা হযরত সৈয়দ মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের মৃত্যুর দিন তিনি জীবন ওয়াকফ (উৎসর্গ) করেন। তার পুত্র স্নেহের মুহাম্মদ আহমদও আমাকে লিখেছেন, তিনি ১৭ মার্চ দিনটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন বলে অভিহিত করতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এই দিনটি আপনার কাছে কেন গুরুত্বপূর্ণ? তিনি বলেছিলেন, এই দিনে আমার পিতার মৃত্যু হয়েছিল এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সেই দিনটি সারাদিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়েছিলেন, এমনকি নামাযও সেখানেই পড়িয়েছিলেন। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যও দিয়েছিলেন, যাতে তিনি (রা.) মীর (মুহাম্মদ ইসহাক) সাহেবের ধর্মসেবা, ওয়াকফের প্রেরণা এবং জ্ঞান প্রভৃতির উল্লেখ করেন। মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব বলেন, আমি বক্তব্য শুনে দণ্ডায়মান হই এবং সেখানেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে বলি, হুযূর, আমি ওয়াকফ করছি। তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি (রা.) এটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখন সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের বয়স ছিল ১৪ বছর আর এরপর তিনি এই অঙ্গীকার এমনভাবে পালন করেছেন যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার।

তার জামাতের সেবার বৃত্তান্ত হলো, ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডে ছিলেন এবং মুবাল্লিগ হিসেবে কাজ করেছেন আর এ-সময়ে তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশে (SOAS) তথা School of Oriental and African Studies -এ শিক্ষার্জন করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র সাথে একত্রে পড়াশোনা করেছেন। কিছু দিন (তিনি) লন্ডন মিশনে সেক্রেটারি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য ন্ত 'ওয়াকালতে দিওয়ান'-এ রিসার্ভ মুবাল্লিগ হিসেবে ছিলেন। এরপর ১৯৬০ সালে জামেয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় মুবাল্লিগ ছিলেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত স্পেনে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত 'উকিলুত তাসনীফ' হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৮৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে সেবা করেছেন। এই সময়ে ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সালের জুলাই (মাস) পর্যন্ত 'উকিলুত তালীম'ও ছিলেন। একইভাবে রিসার্চ সেল (তথা গবেষণা বিভাগের) প্রধান ছিলেন, ক্রুশীয় ঘটনা (সংক্রান্ত) বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। ২০০৫ সালে নূর ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হলে তিনি এর প্রধান নিযুক্ত হন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে ৩রা জুন ১৯৬২ সালে মজলিসে ইফতার মেম্বার নিযুক্ত করেন আর ১৯৭২ সালের নভেম্বর (মাস) পর্যন্ত তিনি এর মেম্বার ছিলেন। এরপর ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে পুনরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে ইফতার মেম্বার নিযুক্ত করেন এবং আজীবন তিনি এপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়াতেও তিনি বিভিন্ন পদে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন, মোহতামিম ও নায়েব সদর হিসেবেও (সেবা করেছেন)। জ্ঞানের জগতেও তার ব্যাপক সেবা রয়েছে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র কুরআনের অনুবাদ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও যার উল্লেখ করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। রাবওয়ার সাহায্যকারীদের মাঝে যাদের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে সুফী বাশারাতুর রহমান সাহেব, মওলানা আবুল মুনীর নূরুল হক সাহেব, সৈয়্যদ আবদুল হাই সাহেব, মওলানা দোস্ত

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

মুহাম্মদ সাহেব, জামীলুর রহমান রফিক সাহেব প্রমুখ সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। এবিষয়ে তিনি (রাহে.) এটিও বলেছেন, মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবও এদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর আল্লাহ্‌র কৃপায় তারা নিয়মিত আমার সাথে কাজ করেছেন, আর তিনি (রাহে.) তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) অনুদিত তরজমাতুল কুরআন-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত)

সিহাহ সিত্তাহ (হাদীসের) সম্পূর্ণ উর্দু অনুবাদ করার পর (তিনি) মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলেরও অনুবাদ করছিলেন। একইভাবে সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যার কাজও চলমান ছিল। তিনি শামায়েল তিরমিযীর অনুবাদও করেছেন। বাইবেল সম্পর্কে অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ও ইঞ্জিলের তিনটি পুস্তকের ব্যাখ্যা লিখেছেন। একইভাবে মসীহ্‌র কাফন, ঈসায়ী মলম, হযরত ঈসা (আ.)-এর হিজরত সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত মানের গবেষণামূলক কাজ করেছেন। তার প্রকাশিত ও অপ্র কাশিত পুস্ত কাদি ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে; সেগুলো হলো- 'সীরাতুন্ নবী (সা.): কানা কুলুকুহুল কুরআন'-এর তিন খণ্ড। আরেকটি হলো 'হামারে পেয়ারে নবী (সা.) কি পেয়ারী বাতেঁ'; একইভাবে 'তিনশ পয়ষট্টি দিন' নামে ছোট্টো একটি পুস্তিকা রয়েছে, নামাযের পরে প্রত্যেক দিন দরস প্রদানের জন্য। আরেকটি হলো, 'ফিলিস্তিন হতে কাশ্মীর'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলির আলোকে 'সীরাতুন্ নবী' সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যউপাত্ত সংকলন করেছেন, এটি এখনো অপ্রকাশিত। সহীহ্ বুখারী থেকে বিভিন্ন তরবিয়তী বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। অনুরূপভাবে প্রাক্তন পোপ যখন আপত্তি উত্থাপন করেছিল তিনি তারও খণ্ডন করেছেন। স্পেনের মসজিদে বাশারাতের ভিত্তি রাখার সময় যে ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) দোয়া করেছিলেন, সেই পাথরও হযরত মোহতরম মীর সাহেব বহন করেছিলেন। অনুরূপভাবে স্পেনের মসজিদে বাশারাত উদ্‌বোধনের সময় তার ও তার স্ত্রী সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর (বক্তব্যে) এর উল্লেখও করেছিলেন।

(সূত্র: খুতবাতে তাহের, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩৯, খুতবা, প্রদত্ত, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২)

১৯৫৫ সালের সালানা জলসার উদ্‌বোধনী অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আটটি বিয়ের এলান করেছিলেন; এর মধ্যে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের বিয়েও ছিল, যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিজের কন্যা আমাতুল মতীন সাহেবার সাথে পড়িয়েছিলেন। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বিয়ের এলানের সময় বলেন, সাধারণত ২৯শে ডিসেম্বর বিয়ের এলান হয়ে থাকে। কিন্তু এই বিয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথমত, একটি বিয়ে আমার নিজের মেয়ে আমাতুল মতীনের, যা মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের পুত্র সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদের সাথে ধার্য হয়েছে। এরপর বিস্তারিত উল্লেখ করেন, যার মাঝে এটিও উল্লেখ করেন যে, মাহমুদ আহমদ বর্তমানে লন্ডনে বি.এ পড়ছে। আল্লাহ্ তা'লা চাইলে আগামী বছর মে মাসে সে ফিরে আসবে। তিনি তার তিনজন সন্তানের উল্লেখ করে বলেন, আমি আমার তিন সন্তানকে তথা জামাতা মীর মাহমুদ আহমদ, (আরেক) জামাতা মীর দাউদ আহমদ এবং তাহের আহমদকে- যে প্রয়াত উম্মে তাহেরের পুত্র, তাদেরকে সেখানে রেখে এসেছি; [এভাবে হুযূর (রা.) মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব, সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ সাহেব ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) -র নাম উল্লেখ করেন;] যেন তারা শিক্ষার্জন করে এবং ভবিষ্যতে জামা'তের সেবা করতে পারে। তাদেরকে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করে। এরপর তিনি (রা.) বলেন, ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারলে, তারা তিনজনই যেহেতু মৌলভী ফাযেল আর আরবী শিক্ষাও তাদের অতি উন্নত মানের, যদি ইংরেজিও ভালভাবে শিখে নেয় তাহলে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং হযরত সাহেবের পুস্তকাদি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর পুস্ত কাবলি ইংরেজিতে অনুবাদ করে জামা'তের প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হতে পারবে। তিনি (রা.) আরো বলেন, বর্তমানে 'রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স' পত্রিকারও একজন উত্তম ও যোগ্য সম্পাদক দরকার। এই উদ্দেশ্যে আমি আমার সন্তানদের সেখানে রেখে এসেছি। যদিও এই অসুস্থ তা ও শারীরিক দুর্বলতার মাঝে তিন সন্তানের, অর্থাৎ দুই জামাতা ও এক সন্তানের এত ব্যয়ভার বহন করা খুবই কঠিন বিষয়, তবুও আমি মনে করি, জামা'তের সমস্যা আমার সমস্যার চেয়ে বড়ো।

(সূত্র: খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৭২-৬৭৪, প্রদত্ত, ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র সর্ব দা এটি খেয়াল থাকতো যে, জামা'তের খাতিরে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তাই তিনি সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছেন; নিজের সম্পদ, সময় এবং সন্তানদের ওয়াকফ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৮২ সালে যখন মরহুমের সবচেয়ে বড়ো ছেলের বিয়ে পড়ান, তখন হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সন্তানদের প্রসঙ্গে সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের উল্লেখ করেন। তিনি (রাহে.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দোয়া গ্রহণ করেছেন এবং নিজের প্রতি তার অর্থাৎ হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের ভালোবাসা দেখে আল্লাহ্ তা'লা তার তিন সন্তানকে ওয়াকফ করার তৌফিক দান করেন। তিনজনের প্রকৃতিই পরস্পরের চেয়ে ভিন্ন, যেভাবে প্রত্যেক মানুষই পরস্পরের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, কিন্তু একটি বিষয়ে যতটুকু আমি লক্ষ্য করেছি, তিনজনের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহ্ দিয়েছেন, যতটুকু দিয়েছেন- তাতে মানুষের শুধু সন্তুষ্ট থাকাই নয়, বরং আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তিনি (রাহে.) বলেন, সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেব নিজের স্বভাবের ছিলেন, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য তার মধ্যেও ছিল। মীর মাসউদ আহমদ, বর্তমানে অনেক দিন ধরে ডেনমার্কে তবলীগের দায়িত্ব পালন করছেন। তার স্বতন্ত্র স্বভাব রয়েছে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি তার মধ্যেও রয়েছে। আর তার ছোটো ভাই মীর মাহমুদ আহমদ, যার সন্তানের বিয়ের এলান আমি করব, তিনিও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের ওয়াকেফে যিন্দেগী; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি তাদের সবার মধ্যেই রয়েছে- অর্থ াৎ জামা'ত যা দেয় তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা এবং কোনো প্রকার দাবিদাওয়া না করা। তিনি (রাহে.) বলেন, তাদের পিতার এই বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে পুরো বংশই পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মামুজান (রা.)-র সন্তানদের অর্থাৎ মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সন্তানদের প্রতি অপার অনুগ্রহ করেছেন। এক্ষেত্রে জামা'তের সামনে তাদের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জামা'তের সামনে তারা যেভাবে সর্বাবস্থায় হাসিমুখে ও প্রফুল্লবদনে থেকেছে, তেমনিভাবে তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে করতে নিজেদের জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করে থাকে।

(সূত্র: খুতবা নিকাহ, ১০ই মে, ১৯৮২, খুতবাতে নাসের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৭২৮-৭২৯)

তারপর তিনি দোয়া করেন, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন এসব গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। তিনি কবিতা লেখার বিষয়েও অনুরাগী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আই.) -এর কবিতা এবং কালামে মাহমুদের কবিতা তো মুখস্থ ছিলই, এছাড়া তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন। একবার তিনি মুরব্বীদের, যারা জামেয়ায় ভর্তি হতে চায় কিন্তু এখনো জামেয়ায় আসে নি, তবে মুরব্বী হওয়ার বাসনা রাখে- তাদের একটি উপদেশ এবং কর্মপন্থা দিয়েছিলেন। এটি একটি চমৎকার কর্মপন্থা, যা মুরব্বীদের দৃষ্টিগোচর রাখা উচিত; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, যে জামেয়ায় আসতে চায় এবং যারা এসে গেছে, তাদেরও।

প্রথম বিষয় তিনি লিখেছেন, প্রতিদিন ভোর তিনটায় উঠে অযূ করে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করুন, (পাকিস্তানের সময় অনুযায়ী এটিই তাহাজ্জুদের সময়)। প্রতিদিন পাঁচবেলার নামায মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত আদায় করুন; আর রাবওয়াতে বসবাসকারীদের উপদেশ দিয়েছেন, কমপক্ষে একবেলার নামায মসজিদে মোব ারকে গিয়ে আদায় করুন। এরপর প্রতিদিন আল্লাহ্‌র সন্তু ষ্টির জন্য, মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা লাভের জন্য, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভালোবাসার জন্য ও খিলাফতের ভালোবাসার জন্য দোয়া করুন। পঞ্চম বিষয় হলো, তসবীহ্, দরূদ শরীফ, ইস্তেগফারকে নিজের (দৈনন্দিন) অভ্যাসে পরিণত করুন। ষষ্ঠ বিষয় হলো, হযরত সাহেব তথা যুগ-খলীফার সমীপে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রেরণা নিয়ে দোয়ার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখুন। সপ্তম বিষয় হলো, নিজের বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য উত্তমরূপে পালন করুন। অষ্টম বিষয় হলো, নিজের পিতামাতার সেবা করুন এবং যদি তারা দূরে থাকেন তবে তাদের দোয়ায় স্মরণ রাখু ন। নবম বিষয় হলো, পবিত্র কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ ও ভাবার্থ শেখার চেষ্টা করুন। দশম বিষয় হলো, রূহানী খাযায়েন কমপক্ষে তিনবার করে অধ্যয়ন করুন। এগারোতম বিষয় হলো, প্রতিদিন আল -ফযল এবং একটি সাধারণ সংবাদপত্র পাঠ করুন। প্রতিদিন কমপক্ষে একটি মানবসেবামূলক কাজ অবশ্যই করুন। তার ছেলে সৈয়্যদ গোলাম আহমদ ফার্‌রুখ তার সম্পর্কে লিখেছেন; আমি তার কয়েকটি বিষয়

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (S)

উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্‌র প্রতি আব্বাজানের যে ভালোবাসা ছিল, নামাযে ও যিকরে এলাহী তথা আল্লাহ্‌র স্মরণে তা প্রকাশ পেতো। (হুযূর বলেন,) আমিও মসজিদে তার নামায পড়া দেখেছি। এক কোণে দাঁড়িয়ে পরম বিনয় ও কাকুতিমিনতির সাথে তিনি নামায পড়তেন। বাড়িতে যেসব নামায তিনি পড়তেন সেগুলোর অবস্থাও এমনটিই হয়ে থাকবে; তা তো আমরা দেখি নি, তবে বাইরেও নামাযের সময় তার এক অদ্ভুত অবস্থা হতো। এমন এক স্বভাবসুলভ ও অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল, তিনি মানুষের সামনে তা প্রকাশ করতে চাইতেন না; কিন্তু তবুও কখনো কখনো প্রকাশ পেয়ে যেত, মানুষজন নিজ থেকেই লক্ষ করত। উদাহরণস্বরূপ, তিনি লিখেছেন, আমি আব্বার নোটবুক ঘাঁটলে তাতে প্রতিদিন 'আল্লাহ্' শব্দটি লেখা দেখতে পাই। খেয়াল করে বুঝতে পারি, যখনই তিনি তার কলমে কালি ভরতেন তখন প্রথমে 'আল্লাহ্' শব্দটি লিখতেন। আর এভাবে কোনো কোনো পৃষ্ঠা বা ডায়েরিতে কয়েক লাইন জুড়ে শুধু 'আল্লাহ্' শব্দটিই লেখা ছিল। তিনি জীবনের শেষ বছরগুলোতে নিজ কক্ষে একটি লাইন লিখেছিলেন, 'হে আমার খোদা! তি আমো!' তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম এর অর্থ কী? তিনি উত্তরে বললেন, 'তি আমো' ইতালীয় ভাষার শব্দ যার অর্থ 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এটি লিখেছেন।

খোদা তা'লার প্রশংসায় তার রচিত একটি নযমও রয়েছে, যার মাঝে এ পঙক্তি রয়েছে: "আমি যেন স্থায়ীভাবে তোমার সাক্ষাৎ ও তোমার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করি।"

অসুস্থতার দিনগুলোতে তার একবার অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন হয়েছিল, তখন "আসসালামু আলাইকুম" শব্দ শুনতে পান, এরপর তিনি সুস্থ হয়ে যান। তার ইবাদত ও নামাযসমূহের দর্শনও খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল; এ দুটিকে পৃথক করা যেত না। (তিনি) কয়েকবার তার তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রথমেই খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তন ও (তাঁর সাথে) সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য দোয়া করি। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন তিনি আমাকে বলেন, আমি প্রতিদিন তাহাজ্জুদের নামাযে আমার চাচা অর্থাৎ হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)-র নযমের পঙক্তি পাঠ করি যা চাচা "তুমি" শিরোনামে লিখেছিলেন। এর প্রথম পঙক্তি এরকম:

"হৃদয়ের বেদনার চিকিৎসা তুমি, তুমি আমার প্রেমাস্পদ!
আমি তোমার চাওয়া আর আমার অভিষ্ট তুমি!"

তার পুত্র বর্ণনা করেন, তাহাজ্জুদের নামাযে দোয়া করার পদ্ধতিও বলেছেন যা সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি। খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তন ও দরূদ শরীফ পাঠ করার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর বংশধর এবং তাঁর খলীফাদের জন্য, এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ ও তাঁর বংশধরদের জন্য পৃথকভাবে (দোয়া করতেন)। এরপর নিজ দাদা হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের মাধ্যমে (দোয়া) শুরু করতেন এবং ক্রমান্বয়ে (বংশধরদের) পরবর্তী ধাপে আসতেন। নিজ সন্তানদের মাঝে প্রথমে নিজ কন্যাদের জন্য, এরপর পুত্রদের জন্য (দোয়া করতেন)। তিনি দোয়াকেই হুকুকুল ইবাদ (তথা বান্দার হক) আদায় করার প্রকৃত মাধ্যম মনে করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা তো ছিলই, কিন্তু তার সবথেকে বেশি ভালোবাসা ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্র তি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তার ছোটো ছোটো কথার মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটত। তার পুত্র বর্ণনা করেন, এক-দুইবার এমনটি হয়েছে, তিনি কোনো শক্ত চেয়ারে বসা ছিলেন ও আমি আরেকটি আরামদায়ক চেয়ারে বসে ছিলাম। আমি উঠে যাই ও তার জন্য চেয়ার খালি করে দেই, কিন্তু তিনি সে চেয়ারে বসেন নি। (না বসার কারণ হলো,) মহানবী (সা.) কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে নিজে সে জায়গায় বসতে নিষেধ করেছেন। নিঃসন্দেহে তুমি আমার পুত্র, কিন্তু অন্যের চেয়ার বা বসার স্থান দখল করে নেওয়া- এটি মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের বিপরীত, তাই আমি বসব না। অনুরূপভাবে রাস্তায় যাতায়াতের সময় প্রথমে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করতেন। জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পর এবং আসরের নামাযের পর দোয়ার রত থাকতেন। আর সে-সময় কারো তার সাথে দেখার জন্য আসা তিনি অপছন্দ করতেন। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি হলো দোয়া কবুল হওয়ার মুহূর্ত। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা তার সন্তানরাও সে-সময় তার নিকট যাওয়া এড়িয়ে চলতাম।

মহানবী (সা.)-এর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে আবশ্যিকভাবে দরূদ শরীফ অধিক হারে পাঠ করার জন্য উপদেশ দিতেন এবং নিজেও অধিকাংশ সময় 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম; আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ' পাঠ করতেন। তিনি বলেন, একবার আমি কাদিয়ান যাই। তখন তিনি আমাকে এই দোয়াটি লিখে দিয়ে বলেন, দারুল মসীহ্‌র প্রত্যেক কামরায় সর্ব প্রথম আমার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ মীর সাহেবের পক্ষ থেকে) একবার এই দোয়াটি পাঠ করবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবরেও এই দোয়া পাঠ করবে। ১৯৯০ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয় যা মজলিসে শূরার মতামত ব্যক্ত করার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ২৯৮-সি ধারা সংক্রান্ত মামলা ছিল। বিচারক তাকে বলে, আপনি বক্তৃতায় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের অবমাননা করেছেন। তখন তিনি কঠোরভাবে বিচারকের সামনেই বিচারকের কথা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলতেন, (বিচারকের) এ কথায় আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। বিচারক তাকে বলেছিল, মীর মাহমুদ আহমদ বিতর্ক চলাকালে মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীদের সম্পর্কে অসম্মানজনক শব্দ ব্যবহার করেছে। তখন মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব বলেন, এটি আমার প্রতি অপবাদ। এটি আগাগোড়া মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! আমি মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর রিসালাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করি। তিনি বলেন, আমি নিজেও সৈয়দ এবং তাঁর বংশের অন্ত র্ভুক্ত আর মিথ্যাবাদীর ওপর অভিসম্পাত প্রেরণ করি। এভাবে বিচারকের সামনে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি এই বক্তব্য প্রদান করেন। অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতেও তিনি বিশেষভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করতেন আর এই শব্দটি বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন, আমি মহানবী (সা.)-এর চাকর। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। তার ছেলে বলেন, আমার স্মরণ আছে, ১৯৮৯ সালে জামাতের শতবার্ষি কী অনুষ্ঠানের সময় দৈনিক আল-ফযল জামা'তের বুযুর্গদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। তিনি শুধু এটিই বলেছিলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন হলো, জীবন্ত খোদার সাথে তিনি পুনরায় মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের বাক্য তিনি বলেছিলেন।

অসুস্থতার কারণে অনেক সময় তিনি কাদিয়ান যেতে পারতেন না, প্রস্তুতি থাকত কিন্তু প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে যেত। কাদিয়ানের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, তাই অন্তিম মুহূর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবরে উপস্থিত হবার গভীর আগ্রহ ছিল; অনেক সময় কষ্ট সহ্য করে চলে যেতেন। তার অধ্যয়ন সম্পর্কে লেখা আছে, কুরআন শরীফ, বুখারী এবং রূহানী খাযায়েন পড়া তার দৈনন্দিন রীতি ছিল এবং আমাদেরকেও এগুলো পাঠ করার উপদেশ প্রদান করতেন। যারা সাক্ষাতের জন্য আসত, তাদেরকেও (এগুলো) অধ্যয়নের উপদেশ প্র দান করতেন। ১৯৯০ সালে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। চিনিউটে এক রাত তিনি হাজতেও কাটিয়েছেন। তার সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, আমাকে বালতি, মগ ও বারাহীনে আহমদীয়া এনে দাও। মিয়া খুরশিদ আহমদ সাহেব তখন সাথে ছিলেন; তিনি বলেন, এত কষ্টদায়ক হাজতে এত গরমে এরূপ কঠিন বই কীভাবে পড়বেন? তিনি বলেন, আমার জন্য এটি কোনো কঠিন বিষয় নয়, আমি এর পূর্বেও পাঁচবার এটি পড়ে শেষ করেছি। যাহোক, সংকীর্ণ জায়গায় গরমের সময় কষ্টের সাথে তিনি এই দিনটি অতিবাহিত করেছেন। যেহেতু তিনি খুবই পরিচ্ছন্ন প্র কৃতির মানুষ ছিলেন, তাই তার জন্য এটি কষ্টদায়ক বিষয় ছিল। কিন্তু তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্ত ক পড়ার চিন্তা ছিল তার মাথায়। ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়াও ইহুদীধর্ম এবং খ্রিষ্টধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা ছিল এবং এই বিষয়গুলোতে তিনি ব্যাপক দক্ষতা রাখতেন। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তিনি ব্যাপক দক্ষতা রাখতেন। প্রথাগত ফিকাহ সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ রাখতেন না। সর্বদা এ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, পবিত্র কুরআন, সুন্নতে রসূল (সা.), সহীহ হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাদের বাণী থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করো। জাগতিক জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান অধ্যয়ন, ইতিহাস অধ্যয়ন, একইভাবে বিনোদনের জন্য হাইকিং সংক্রান্ত অনেক পুস্ত ক তিনি পাঠ করতেন। ইংরেজ ও উর্দু কবিদের কাব্যও পড়েছেন এবং অনেক কবির পঙক্তিও মুখস্থ ছিল। তার আইপ্যাডে কবিদের কবিতাও শুনতেন। ভাষা রপ্ত করার যোগ্যতা ছিল। উর্দু, আরবী ও ইংরেজী ছাড়াও স্প্যানিশ, ইতালীয় ও হিব্রু ভাষাতেও বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইতালীয় ভাষার অনুষ্ঠান টিভি ও আইপ্যাডে নিয়মিত দেখতেন। এর কারণ হলো, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কোনো এক সময় তাকে ইতালীয় ভাষা শিখতে বলেছিলেন এবং এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, হুযূর (রা.) তাকে ইতালি পাঠাবেন। তিনি বলতেন, হুযূর বলেছিলেন, ভাষা শেখো, তাই আমি ভাষা শিখছি। এই নির্দেশ তো রহিত করা হয় নি! তাই এখনো এই নির্দেশ আমার জন্য বলবৎ আছে, এজন্য আমি তা অব্যাহত রাখব। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর্থিক কুরবানী করতেন। তদ্রূপ উত্তরাধিকারসূত্রে যতটুকুই সম্পদ পেয়েছেন তৎক্ষণাৎ এর হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করেছেন।

বর্তমান (রাবওয়া জামেয়ার) প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব লেখেন, মীর সাহেব অত্যন্ত নিষ্পাপ ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। অত্যন্ত পরিশীলিত অথচ বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। স্বল্পেতুষ্টি ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্‌র (তথা আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থার) এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত ছিলেন। জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র ছিলেন। অনেক বড়ো আলেম ছিলেন। এ সবই সঠিক। মুফাসসেরও ছিলেন, মুহাদ্দেসও ছিলেন। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে তিনিই প্রথম সৌভাগ্যবান আলেম যিনি পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার পাশাপাশি পুরো সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র উর্দু অনুবাদ করারও সৌভাগ্য লাভ

করেছেন। মীর সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল– কাজ, কাজ আর শুধুই কাজ। মীর সাহেবের অভিধানে ছুটি নামক কোনো শব্দ ছিল না। মীর সাহেব খিলাফতকে দর্শনের দর্পণ ছিলেন, যিনি আমাদেরকে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন। নিজ কর্ম দ্বারা দেখিয়েছেন, খিলাফতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এভাবে করতে হয়। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাইকেলে করে যথাসময়ে যেতেন। সকাল ৭:২০ মিনিটে জামেয়া শুরু হতো, ৭:২০ মিনিটেই পৌঁছে যেতেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২-৩ বার সাইকেল থেকেও পড়ে গিয়েছেন। তাকে আমি বলেছিলাম, আপনি ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, (অর্থাৎ) আপনি জামেয়ায় ১০টার সময় যান। আর একথাকেও তিনি নির্দেশ মনে করে ১০টার সময়ই দপ্তরে যেতেন। বরং মুবাশ্বের সাহেব এটিও লিখেছেন, একদিন ১০টার পূর্বে এসে বাইরে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমি কিছুক্ষণ তার জন্য অপেক্ষা করি। এরপর আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি বাইরে কেন পায়চারি করছেন? ভেতরে কেন আসছেন না? তিনি উত্তরে বলেন, এখনো ১০টা বাজে নি। আর যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আমি যেন ১০টায় দপ্তরে যাই। এজন্য আমি ১০টায় দপ্তরে যাব। এটি তার একটি দৃষ্টান্তমূলক আনুগত্য ছিল। তিনি মানুষের জন্য একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কর্মকর্তাদের জন্যও এবং অধীনস্তদের জন্যও।

কাদিয়ানের মুরব্বী তানভীর নাসের সাহেব বলেন, তার একটি বিষয় যা আমার হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে তা হলো, একদিন কাদিয়ানের মসজিদে মুবারকে বসা ছিলাম; মীর সাহেব মসজিদের প্র থম সারিতে পায়চারি করছিলেন। আমার কাছে তার এই পায়চারি করা ও দোয়া করতে দেখা খুব ভালো অনুভূত হচ্ছিল এবং আমি খুব উপভোগ করছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার মধ্যে যখন সাহস সঞ্চার হয় তখন আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে নিবেদন করি, আপনি মসজিদের প্রথম সারিতে পায়চারি করছেন, এর কারণ কী? তিনি উত্তরে বলেন, আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে এই জায়গায় পায়চারি করতে দেখেছি, আর আমিও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে পায়চারি করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র প্রতি এক অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল।

ফিরোয আলম সাহেব লেখেন, আমি জামেয়ায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে থাকা অবস্থায় মীর সাহেব জামেয়ার প্রিন্সিপাল হয়ে আসেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। শিক্ষাদানের চেয়ে তিনি অধিক ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে, আলেম বা-আমল হয়ে আমাদের তরবিয়ত করেন। আমি তার দরস প্রভৃতি সাধ্যানুযায়ী শুনতাম ও তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতাম। তিনি আমাদেরকে তুলনামূলক ধর্ম তত্ত্ব পড়িয়েছেন। অধিকাংশ সময় তিনি আমাদেরকে সেসব দলিল-প্রমাণ লেখাতেন ও বোঝাতেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজ প্রবন্ধগুলোতে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, একবার তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মু'জিযার বিষয়ে আমাদেরকে পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে বলেন, বর্তমানেও কি মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে থাকে? তারপর তিনি নিজের এক অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে গিয়ে বলেন, একবার জলসার সময় কোথাও তার ডিউটির সময় এমন হয় যে, খুব অল্প খাবার অবশিষ্ট ছিল। ইতোমধ্যে বেশ কিছু অতিথি এসে যান। সামান্য যেটুকু খাবার ছিল সেটাই বণ্টন করা আরম্ভ করি। আল্লাহ্ তা'লা বরকত দিতে থাকেন; সবাই খায় এবং কোনো স্বল্পতা অনুভূত হয় নি।

তার পৌত্র স্নেহের হাশের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভীষণ ভালোবাসা ছিল। তিনি ছোটো-বড়ো সবার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কন করে গেছেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন, (পাঁচবেলার) নামাযেও নিয়মিত ছিলেন। ইনিও যেহেতু মুরব্বী হয়েছেন, তাই তারও নিজের দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করা উচিত। কুরআন করীমের প্রতি এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে, এমন ভালোবাসা কখনো দেখি নি। ফজরের পরে দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলেন, আমি তিফল থাকাকালীন তার বাসায় কিছুদিন থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পর ফজরের নামাযের জন্য আমাকে ওঠাতেন, এরপর দীর্ঘ তিলাওয়াত করতেন। ভীষণ মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে পাঠ করতেন যা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তিনি বলেন, আমি যখন জামেয়ায় ভর্তি হই; [তিনি কানাডার জামেয়ায় ভর্তি হন;] যখনই সেখানে যেতাম তিনি জিজ্ঞেস করতেন, কুরআন করীমের অনুবাদ ও তফসীর পৃথকভাবে পড়ায় নাকি একসাথে? আমি তাকে বলি, পৃথক পৃথক। এতে তিনি খুশি হয়ে বলেন, এমনটাই হওয়া উচিত, কেননা মানুষ তফসীর করতে পারে ঠিকই কিন্তু অনুবাদ পারে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্র তি ভালোবাসার কথা এভাবে উল্লেখ করেন: তিনি রূহানী খাযায়েনের পাগল ছিলেন। আমাকে কয়েক বার এটি বলেছেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিতাব অনেক বার পড়েছি, কিন্তু প্রতি বারই নতুন বিষয় উন্মোচিত হতে থাকে। আমাকে বলতেন, রূহানী খাযায়েন পড়লে তুমি কুরআন, হাদীস, সীরাত সবকিছু বুঝতে পারবে। একথা তিনি আমাকেও একবার বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল বই তিন বার অবশ্যই পড়েছি এবং কোনো কোনো বই তো তিন বারের বেশিও পড়েছি। এ সত্ত্বেও তিনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা ছিলেন, কখনো জ্ঞান জাহির করতেন না। তিনি বলেন, তিনি একবার বাড়িতে বসে খুতবা শুনছিলেন, ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ চলে যায়। পাকিস্তানের রাবওয়াতে প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে যায়। টিভি বন্ধ হয়ে যায়। আমি তখন ছোটো ছিলাম, আমি উঠে চলে যেতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, বসো! এটি নিশ্চিত নয় যে, কখন বিদ্যুৎ চলে আসে এবং যুগ-খলীফার খুতবা পুনরায় আরম্ভ হয়ে যায়; তুমি এতগুলো শব্দ হাতছাড়া করবে? এটি তার কাছে অসহনীয় ছিল। তিনি বলেন, বসো এবং দোয়া করতে থাকো, যাওয়ার অনুমতি নেই। এর মাঝেও অনেক কল্যাণ নিহিত। একবার কোনো একটি অনুষ্ঠান ছিল যেখানে আমার বক্তৃতা ছিল। তিনি সংবাদ পান নি এবং শুনতেও পারেন নি। এমটিএ চালু করলে দেখেন, ততক্ষণে তা শেষ হয়ে গিয়েছে। কোনো একজন খাদেমকে বলেন। আইপ্যাডে তা চালু করার চেষ্টা করলে দেখা যায়, সেখানে অন্য ভাষায় তা হচ্ছে, কিন্তু তিনি সেটিই শুনতে থাকেন। এরপর আমি যখন আসি তখন আমি সেটি উর্দুতে লাগিয়ে দেই, যার ফলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তুমি আমার অনেক উপকার করেছ আর আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ! তিনি ছোটোদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স-এর সম্পাদক আমের সাফীর সাহেব বলেন, আমিও তার মাঝে খিলাফতের প্রতি অদ্ভুত, বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছি। তিনি বলেন, আমি এই বিভাগের দায়িত্ব পেলে তিনি এসে আমাকে বলেন, [বরং আমি নিজেই তাকে অর্থাৎ আমের সাফীর সাহেবকে বলি,] আপনি আলেমদের বলুন, তারা যেন রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের জন্য প্রবন্ধ লেখে। আর আমি কিছু আলেমের নামও বলেছিলাম যাদের মাঝে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবের নামও উল্লেখ করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি তখন পাকিস্তানে। তিনি বলেন, আমি ফোন করলে তার স্ত্রী ফোন ধরেন। আমি তাকে বলি, আমাকে এবিষয়ে কথা বলতে হবে। তিনি বলেন, তিনি তো ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু এরই মধ্যে মীর সাহেবের চোখ খুলে যায়। ফোন কলের আওয়াজ শুনতে পেয়ে অথবা কথাবার্তার আওয়াজে তিনি জাগ্রত হন। তারপর তিনি কথা বলেন। আমি তাকে বলি, খলীফাতুল মসীহ্ বলেছেন, আপনি অমুক বিষয়ের ওপর রিভিউ অব রিলিজিয়ন্সের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখুন। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমি সকালে জানাচ্ছি। পরদিন মীর সাহেব ১৫ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ লিখে আমাকে (অর্থাৎ হুযূরকে) পাঠান। আমি সেটি আমের সাফীরকে পাঠিয়ে দিয়ে বলি, এটি তার (তথা মীর সাহেবের) পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। মীর সাহেব আমাকে লিখেছিলেন, রাতের বেলা একটি ছেলে ফোন করে আমাকে বলেছিল, খলীফাতুল মসীহ্ আমাকে এই প্রবন্ধ লেখার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি এই প্রবন্ধ লিখলাম। ১৩ পৃষ্ঠার প্রথম কিস্তি প্রেরণ করছি এবং পরবর্তীতে আরো পাঠাতে থাকব। এটি ছিল তার আনুগত্যের মান। সময়ের ক্ষেত্রে আনুগত্যের বিষয়ে পূর্বে ই আমি উল্লেখ করে দিয়েছি; দশটা না বাজলে তিনি অফিসে প্রবেশ করতেন না, দশটা বাজলেই প্রবেশ করতেন।

প্রতি বছর জলসার সময় কাফনে মসীহ্ সম্পর্কিত তার যেই অনুষ্ঠান হতো এবং এ সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে অংশ নিতেন এবং সবকিছু হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকে বর্ণনা করতেন। আমের সাফীর লেখেন, মীর সাহেব বলতেন, মুরব্বীরা যখন কোনো জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে অধ্যয়ন করেন তখন তারা মূল বিষয় অর্থাৎ জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে জাগতিক রেফারেন্সের দিকে বেশি মনোযোগ দেন। কিন্তু তার রীতি ছিল, তিনি প্রথমে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বুঝতেন এবং পরবর্তীতে জামা'তের বাইরের অথবা জাগতিক দৃষ্টিকোণগুলো দেখতেন, এর বিপরীতটি নয়। তিনি বলেন, মীর সাহেব অত্যন্ত দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বের নামকরা কাফন বিশেষজ্ঞদের সামনে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশ্বাস উপস্থাপন করতেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ থেকে বেঁচে যাবার ঘটনা উপস্থাপন করতেন। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স টিম দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করে আসছিল। তাদের চেষ্টা ছিল, শ্রাউড (তথা কাফনের কাপড়) বিষয়ে বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরে জামা'তের অবস্থানকে মজবুত করা। কিন্তু এর বিপরীতে এ বিষয়ে মীর সাহেবের কৌশল ছিল ভিন্ন। তার মতে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মারহামে ঈসা (বা ঈসায়ী মলম) বিষয়ে জোর দিয়েছেন। একারণে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তব্যসমূহকে মূল ভিত্তি বানিয়ে অন্যান্য দিকগুলোকে শাখার মর্যাদা দেওয়া উচিত। তিনি বার বার এই মত উপস্থাপন করতেন, মারহামে ঈসা হচ্ছে ক্রুশের ঘটনাকে বোঝার চাবিকাঠি। রিভিউ টিমের প্রচেষ্টায় যদিও জামা'তের নৈতিক ভাবমূর্তি শক্তিশালী হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হয়েছে, কিন্তু জ্ঞানগত পর্যায়ে কোনো কার্য করী প্রভাব ফেলতে পারে নি। তিনি বলেন, কিন্তু মীর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 26-June-3 July, 2025 Issue No.26-27

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত নিজ প্রভাব দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রাউড (বা কাফনের কাপড়) বিষয়ক সেই সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ও আলোকচিত্রী ব্যারি শোয়ার্টয নিজেই স্বীকার করেছেন, যদি আপনারা সত্যিই মারহামে ঈসা সংক্রান্ত আপনাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমাকে স্বীকার করতে হবে, ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।

তার বহু ঘটনা রয়েছে যা অন্যান্যরাও লিখেছেন; তার সন্তানরা, তার বংশধররা, জামা'তের সদস্যরা, ওয়াকেফীন এবং মুবাল্লিগরাও লিখেছেন যা বর্ণনা করা কঠিন। একটি বিষয় যা সকল মুরব্বী না লিখলেও অনেকেই লিখেছেন, তা হচ্ছে– তিনি বলতেন, একটি শব্দ হৃদয়ে গেঁথে নাও। তা হলো 'কবর' এর ওপর আমল করো। এই 'কবর' শব্দের অর্থ তিনি বলেছেন, 'কাফ' হলো কুরআন, 'বা' হচ্ছে বুখারী তথা হাদীসের পুস্তক এবং 'রা' হচ্ছে রূহানী খাযায়েন। তিনি প্রায়ই বলতেন, তোমরা যদি এগুলোর পাণ্ডিত্য অর্জন করো ও এগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করো, জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করো আর এগুলো হতে আধ্যাত্মিকতা অর্জনের চেষ্টা করো, তাহলে তুমি তোমার লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। এমনিতেও 'কবর' এমন একটি শব্দ যেটিকে মানুষ সর্বদা স্মরণে রাখলে আল্লাহ্ তা'লাও স্মরণে থাকে। আর খোদা তা'লা স্মরণে থাকলে মানুষ তাকওয়ার পথে চলারও চেষ্টা করে। যাহোক, তিনি খিলাফতের একজন মহান সাহায্যকারী ছিলেন, নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, প্রতিটি বিষয় অক্ষরে অক্ষরে পালনকারী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। এমন 'সুলতানে নাসীর' অর্থাৎ শক্তিশালী সাহায্যকারী ছিলেন যারা বিরল হয়ে থাকেন। এমন একজন আলেম ছিলেন যার কথা ও কাজ ছিল এক–অভিন্ন। বর্তমানে আমি অন্ততপক্ষে তার মতো কাউকে দেখি না। আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডারে তো কোনো ঘাটতি নেই, তাই আল্লাহ্ করুন, এমন আদর্শ ব্যক্তিত্ব যেন আরো অনেক সৃষ্টি হয় আর আহমদীয়া খিলাফতকে এরকম বিশ্বস্ত, নিষ্ঠাবান ও তাকওয়াপরায়ণ সাহায্যকারী আল্লাহ্ তা'লা দান করতে থাকুন। আর তার সন্তানদেরকেও তাদের পিতার দোয়ার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন এবং তার আদর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী চলার তৌফিক তাদেরকে দান করুন।

যেমনটি আমি বলেছি, দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো গোলাম রসূল সাহেবের পুত্র করাচি নিবাসী ডাক্তার তাহের মাহমুদ সাহেবের যিনি কিছুদিন পূর্বে (আল্ল াহ্র খাতিরে) কারাবন্দি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল সত্তর বছর। বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী করাচির মালির কলোনি হালকার প্রেসিডেন্ট মরহুম তাহের মাহমুদ সাহেবকে (জামা'তের) দুইজন সদস্য যথাক্রমে ইজায হোসেন সাহেব এবং আইয়ায হোসেন সাহেবের সাথে করাচির মালির কলোনিতে নিজেদের মসজিদের অবকাঠামো নির্মাণ এবং সেখানে জুমুআর নামায পড়ার অভিযোগে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে আর গ্রেফতার করে। আগাম জামিন নেওয়া হলেও পরবর্তীতে তার জামিন বাতিল করা হয় আর তাকে গ্রেফতার করা হয়। জামিনের জন্য যখন আদালতে ছিলেন তখন বিরুদ্ধবাদী লোকজন এবং বিরুদ্ধপক্ষের উকিলরা তার ওপর আক্রমণ করে আর তাকে সংহিসতার লক্ষ্যে পরিণত করে এবং ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেয়। এমনকি পুলিশের একজন কর্ম কর্তা সেই লোকদের বলে, তাকে গুলি করো! আর থানায়ও তার ওপর অনেক নির্যাতন করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের বিরুদ্ধে কটুক্তি করতে জোরাজুরি করা হয়, কিন্তু তিনি দৃঢ় ছিলেন এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। এরপর তাকে বিচারিক প্রক্রিয়ায় জেলে স্থানান্তর করা হয়। জেলে তিনি দুই মাস ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তার কিডনিতে ইনফেকশন হবার কারণে জেলেই তার শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটলে পরে তাকে সেখান থেকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুর সময়ে হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেও তার হাতে হাতকড়া লাগানো ছিল। তার মৃত্যু নির্যাতনের কারণেও হতে পারে, কেননা এর কারণে হয়ত শরীরের ভেতরে আঘাত পেয়ে থাকবেন। এদিক থেকে তিনি বন্দি জীবনের কঠোরতা সহ্য করেছেন এবং আদালতের সামনে তিনি মার খেয়েছেন। এগুলো এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ যেগুলোর নিরিখে তিনি শাহাদতের মর্যাদাই প্রাপ্য এবং শহীদদের দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবেন। তিনি একজন ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ও দাওয়াতে ইলাল্লাহ্'র সেক্রেটারি হিসেবে এবং জামা'তী বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনেরও দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বড়ো চাচা হাকীম আহমদ দীন সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সাহাবী হযরত মৌলভী ইমাম দীন সাহেবের মাধ্যমে ১৯২০–এর দশকে দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াতের ভুবনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তার পিতাও আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রদের পরিচয় গোপন রেখে তাদেরকে আর্থি ক সহায়তা প্রদান করতেন। অনেক দরিদ্র যুবক–যুবতীর বিয়ের ব্যয়ভার বহন করেছেন। জেলের ভেতরেও কয়েদি সঙ্গীদের সাহায্য–সহযোগিতা করেছেন। তার কারাগারে থাকাকালে সাক্ষাতের সময় কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা জানতে চাইলে তিনি বলতেন, অসুবিধার কী আছে! আমি তো এখানে ধর্মের কারণে এসেছি। আমি তো এখানে তবলীগ করার সুযোগ পাচ্ছি। সেই সময়েও (কারাগারে তিনি) নির্ভীকভাবে ও সাহসিকতার সাথে তবলীগ করেন। ১৯৮৮ সালের ১৭ জানুয়ারি করাচির মালির কলোনি থানায় তাহের মাহমুদ সাহেবের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এক বাদী অভিযোগ করেছিল, ইনি আমার ছোটো ভাইকে বয়আত করিয়েছিলেন। সেই সময়েও তিনি বন্দি ছিলেন। এটি তার দ্বিতীয় বারের মতো কারাবরণের সৌভাগ্য ছিল। তিনি আরো অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। তার ওপর তিন বার আক্রমণও হয়েছে, কিন্তু নিজের বিষয়টি তিনি খোদার দরবারে ন্যস্ত করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, (তার ওপর) আক্রমণকারীদের একজনকে খোদা তা'লা পাকড়াও করেছেন। এরপর সেই শত্রু ব্যক্তিগত কোনো লড়াই–ঝগড়ায় নিহত হয়, যার ফলশ্রুতিতে অপর দুইজন (শত্রু) তার বাড়িতে গিয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমাপ্রার্থ না করলে তিনি তাদেরকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দেন; কোনো মামলা দায়ের করেন নি।

মরহুমের স্ত্রী বলেন, আমার সাথে তার আচার–আচরণ ছিল আদর্শস্থানীয়। তিনি জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। (তিনি) রাতে (দেরিতে) বাড়ি ফেরার পরও আমি কখনো তার কাছে কোনো অভিযোগ করতাম না এবং বাধা দিতাম না। কেননা আমার আত্মিক প্র শান্তি ছিল, (আমার) মৃত স্বামীর এই কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে আমাদের (সকল) কাজ করে দিচ্ছেন। তার সন্তানদের মাঝ থেকে যিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী মুরব্বী সিলসিলা– তিনি লেখেন, ১৯৮০–র দশকে (আমার পিতার) আল্লাহ্র পথে কারাবরণের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই সময় পুলিশ তার ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিল। কেউ সেই নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে সাবধানতা অবলম্বন করতে বললে তিনি অত্যন্ত আবেগআপ্লুত হয়ে বলতেন, পুলিশের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাই আমার আর কোনো ভয়ভীতি নেই। এখন তো আমি নির্ভয়ে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র কাজ করি।

তার অর্বতমানে তিনি তার স্ত্রী মোহতরমা মুবাশ্বেরা সাহেবা ছাড়াও একজন কন্যা ও তিনজন পুত্রসন্তান রেখে গেছেন। (তার) পুত্র মুনীব মাহমুদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, যিনি পাকিস্তানেই কর্মরত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন। (জুমুআর) নামাযের পর (গায়েবানা) জানাযা হবে।

****

মহান আল্লাহ্র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Late-Azima Khatun,**
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir